জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩

সমবায়

বঙ্গবন্ধুর
দর্শন
সমবায়ে
উন্নয়ন

সমবায় অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা

সমবায়

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩ সংখ্যা

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা
- ড. তরুণ কান্তি শিকদার
  নিবন্ধক ও মহাপরিচালক
  সমবায় অধিদপ্তর

সভাপতি
- অঞ্জন কুমার সরকার
  অতিরিক্ত নিবন্ধক (ইপিপি)

সদস্য
- মৃনাল কান্তি বিশ্বাস
  যুগ্মনিবন্ধক (ইপিপি)
- শাকিলা হক
  উপনিবন্ধক (পিপি)
- মোঃ আবুল খায়ের
  উপনিবন্ধক (ইপি)

সদস্য সচিব
- মোঃ সাইফুল ইসলাম
  সম্পাদক

মূল্য
- পঁচিশ টাকা

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
- মনিরুল ইসলাম

সমবায় উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে সমবায় অধিদপ্তরের সদর কার্যালয় ঢাকা থেকে প্রকাশিত
ফোন : ৫৮১৫৫৫০৩, ৪৮১১১৮০৫
ই-মেইল : coop_bangladesh@yahoo.com
ওয়েব সাইট: www.coop.gov.bd
ফ্যাক্স : ৯১৩৬৫৯৫

সূচিপত্র

- ৫১তম জাতীয় সমবায় দিবসের অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা ও সমবায়ভিত্তিক আবাসন ৩
- ভ্রমণ: সাজেক ভ্যালি: ড. তরুণ কান্তি শিকদার ৬
- পর্যটন শিল্পে সমবায়: ভুবন বিশ্বাস ১৯
- সমবায় অধিদপ্তরে অমর একুশে আলোচনা, প্রকাশনা উৎসব ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ২২
- 'অমর একুশে বইমেলা-২০২৩'-এ সমবায় অধিদপ্তরের অংশগ্রহণ ২৪
- সমবায় অধিদপ্তরে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৩ উদযাপন ২৫
- সমবায় অধিদপ্তরের ঐতিহাসিক ৭ মার্চ পালন ২৬
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও শিশু দিবস ২০২৩ পালন ২৬
- স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট সমবায়: হরিদাস ঠাকুর ২৮
- সমবায় ব্যবস্থায় আর্থসামাজিক উন্নয়নে সফলতা ও চ্যালেঞ্জ: কিউ আর ইসলাম ৩১
- সমবায়ের মাধ্যমে গণমানুষের উন্নয়নে আমাদের দায়-দায়িত্ব: অজয় কুমার সাহা ৩৩
- জনসংখ্যাগত মুনাফা, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সমবায়: রাশিদা মুস্তারিন ৩৬
- নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়: সামিয়া সুলতানা ৩৮
- সমবায়ের সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ- প্রেক্ষাপটে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিসমূহ: মোঃ সেলিমুল আলম শাহিন ৪০
- তরুণদের ভাবনায় সমবায়: মোঃ আল-আমিন ৪৪
- নেপালে সমবায়ের চিত্র: এম. এম. মোর্শেদ ৪৬
- সমবায়ে সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা: শারমিন আক্তার ৪৯
- সমবায় শৃঙ্খলাসহ উন্নতির ধারক ও বাহক: মো. আব্দুল বাকী চৌধুরী নবাব ৫১
- পাহাড়ি জুমচাষিদের অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সমবায় হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র: রত্ন কান্তি রোয়াজা ৫৩
- আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, নওগাঁ'র- প্রশিক্ষণ কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ বাস্তবায়নে করণীয়: অনিরুদ্ধ মুখার্জী ৫৬
- উত্তর আমেরিকার সমবায় সমিতি ও আমরা: রাফায়েল পালমা ৫৮
- বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলা নিষ্পত্তি বিষয়ক কর্মশালা ৬১
- চট্টগ্রামে সমবায়ীদের সাথে মতবিনিময় ও সমবায় পণ্য প্রদর্শনী ৬২
- 'বঙ্গবন্ধু গণমুখী ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা' প্রকল্পের উপকারভোগীর হাতে ঋণের চেক বিতরণ কার্যক্রম ৬৪

৫১তম জাতীয় সমবায় দিবসের অনুষ্ঠানে

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা ও সমবায়ভিত্তিক আবাসন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশকে আরও এগিয়ে নিতে জনগণকে একত্রিত করে সমবায় গঠনের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দেশের যুব সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমাদের যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। যদি যুব সমাজ এগিয়ে এসে সমগ্র গ্রাম ও মানুষকে এক করে সমবায়ের মাধ্যমে কার্যক্রম চালাতে পারে তাহলে আমরা অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবো। কারণ, সবারই একটা দায়িত্ব থাকবে।' প্রধানমন্ত্রী ৫ নভেম্বর ২০২২ তারিখে '৫১তম জাতীয় সমবায় দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন। এ বছর সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ের উন্নয়ন'। তিনি গণভবন থেকে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'আপনারা (যুব সমাজ) সেখানে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপন করতে পারেন, যা শুধু স্থানীয় চাহিদাই মেটাবে না, বিদেশেও রপ্তানি করা সম্ভব হবে।' তিনি আরো বলেন, সমবায়ের মাধ্যমেই দেশ কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করতে পারে। তিনি কোভিড -১৯ মহামারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পাশাপাশি নিষেধাজ্ঞা ও পাল্টা নিষেধাজ্ঞার কারণে দেশে যে সংকট তৈরি হয়েছে তা কাটিয়ে উঠতে সকলকে একত্রিত হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. তরুণ কান্তি শিকদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম, এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মো. মশিউর রহমান। শুরুতে জাতীয় সমবায় দিবসের একটি ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে মোট নয়টি সমবায় সমিতি এবং একজন ব্যক্তিকে জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০২১ প্রদান করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের মানুষের কল্যাণ করাই তাঁর সরকারের লক্ষ্য এবং এ জন্য সমবায়কে গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন, আমরা মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছি কিন্তু নিজের জীবন-জীবিকাকে উন্নত করার প্রত্যেক মানুষেরও আলাদা একটা চিন্তা থাকতে হবে। সে ক্ষেত্রে এই কাজগুলো করার সুযোগ আমরা করে দিতে চাই। শেখ হাসিনা বলেন, তাঁর সরকার প্রত্যেকটি সেক্টরকেই বেসরকারি খাতে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। যার প্রধান লক্ষ্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি। সে ক্ষেত্রে আমাদের কৃষি উৎপাদন ও মানুষের জীবন-জীবিকার জন্য সমবায় একান্তভাবে অপরিহার্য। কারণ, এতটা ঘন বসতির দেশে সমবায়ই আমাদের অনেক সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। কাজেই সেদিকে লক্ষ্য রেখেই সমবায় আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। তিনি উপজেলা পর্যায়ে দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম বিস্তৃত করায় সমবায় অধিদপ্তরকে ধন্যবাদ জানান। কারণ, এর ফলে প্রায় ৫ হাজার পরিবার উপকৃত হবে। শিশুরা যেমন দুধ খেতে পারবে তেমনিভাবে বয়োবৃদ্ধদেরও পুষ্টির সংস্থান হবে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। সমবায়ভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়নেও প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আমরা পশু কোরবানীর ক্ষেত্রে নিজেরাই স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি উল্লেখ করে সরকার প্রধান সকল ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল হবার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন। তাঁর সরকার 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের প্রকল্প নিয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ঋণের বোঝা তাদের টানতে হবে না। সমবায়ের থেকে নেওয়া ঋণ থেকে তাদেরকে সঞ্চয়ী হতে হবে। এর মাধ্যমে কেউ আর পর মুখাপেক্ষী থাকবে না। সবাই নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আত্মমর্যাদা নিয়ে বাঁচতে পারবে।' মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার প্রত্যেকটি গ্রামকেই শহরে রূপান্তরিত করতে চায় উল্লেখ করে সরকারের 'আমার গ্রাম আমার শহর' প্রকল্প প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ফসলী জমি নষ্ট করে বিক্ষিপ্তভাবে ঘর-বাড়ি তৈরি না করে সরকার 'পল্লী জনপদ' নামেও একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। যেখানে সমবায়ের মাধ্যমে উন্নত ঘর বাড়ি করে দেওয়া হচ্ছে, যেখানে তারা চাইলে ফ্লাট কিনতে পারবে। সরকারের বাস্তবায়নাধীন 'বঙ্গবন্ধু মডেল ভিলেজ' প্রকল্প সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রাকে আরো উন্নত করবে বলেও তিনি এ সময় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রী চলমান বৈশ্বিক মন্দা মোকাবিলায় দেশের প্রতি ইঞ্চি জমিকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ানোর আহবান পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, 'আগামীতে আমাদের দেশে যেন খাদ্য সংকট দেখা না দেয় সে জন্য আমাদের উৎপাদন বাড়াতে হবে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার পাশাপাশি খাদ্য পুষ্টির ও জোগান দিতে হবে।' সরকার প্রধান বলেন, দেশের সকল গৃহহীনকে ঘর-বাড়ি করে দেওয়ার তাঁর সরকারের 'আশ্রয়ণ' প্রকল্পে ঘর দেওয়ার পাশাপাশি ভূমিহীনদের একটি সমিতিও করে দেয়া হয়। যেখানে ২ হাজার ৮শ' সমবায় গড়ে উঠেছে। যার সদস্য সংখ্যা ৪ লাখ ৪০ হাজার। তিনি বলেন, 'সমবায় মন্ত্রণালয়কে বলবো 'আশ্রয়ণ' প্রকল্প বা 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্পে যে সমস্ত সমবায়গুলো করা হয়েছে তাদের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থেকে তারা যাতে আরো উন্নতভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে সে সুযোগও সৃষ্টি করতে হবে।' 'বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব' মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারী সমবায় সৃষ্টি এবং তাদের দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্ত সৃজন প্রকল্প বাস্তবায়নের যে উদ্যোগ তাকেও সাধুবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানের ১৩(খ) নং অনুচ্ছেদে সমবায়কে সম্পদের মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং সমবায়কে গণমুখী আন্দোলনে পরিণত করার ডাক দিয়েছিলেন। যে পদাংক অনুসরণ করে তাঁর সরকার 'সমবায় সমিতি আইন-২০০১' এবং জাতীয় সমবায় নীতিমালা-২০১২ প্রণয়ন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন, আমরা মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছি কিন্তু নিজের জীবন-জীবিকাকে উন্নত করার প্রত্যেক মানুষেরও আলাদা একটা চিন্তা থাকতে হবে। সে ক্ষেত্রে এই কাজগুলো করার সুযোগ আমরা করে দিতে চাই।

করে দিয়েছে। তিনি এর কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার আহবান জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। আর সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জন করতে পারবে বলেই আমি বিশ্বাস করি। অনুষ্ঠানে ৯টি সমবায় সমিতি এবং একজন সমবায়ীকে জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০২১ প্রদান করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রত্যেক সমবায় সমিতি ও এক ব্যক্তিকে একটি করে স্বর্ণ পদক এবং সনদপত্র প্রদান করা হয়। সূত্র: বাসস

৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০২২ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমবায় খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মানুষের জীবন জীবিকার সংস্থানে সমবায়কে আরও শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে হবে। উৎপাদন ব্যবস্থায় এক টুকরা জমিও যেন পড়ে না থাকে সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে সমবায়ের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনের দিকে আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে, এর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করতে হবে।

যুব কর্মসংস্থান সৃষ্টি

যুব সমাজ ও গ্রামের মানুষকে এক করে সমবায়ের মাধ্যমে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধির পদক্ষেপ নিতে হবে, যারা যুবসমাজ তারা শুধু চাকরির পেছনে না ছুটে নিজেরা কাজ করতে পারে, নিজেরা খামার তৈরি করতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে।

নারীর ক্ষমতায়ন

সমবায় কার্যক্রমে মহিলাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিতে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারী সমবায়ীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা সৃজন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।

সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের পাশাপাশি তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আশ্রয়ণ প্রকল্প এবং আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পে যেসমস্ত সমবায় করা হয়েছে তাদের কার্যক্রম এর সাথে সম্পৃক্ত থেকে তাদের তাদেরকে আরও উন্নত করার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রামে আবাসন সুবিধা সৃষ্টি

আমার গ্রাম, আমার শহর ধারণার আলোকে প্রত্যেকটি গ্রামকে শহরে রূপান্তর করতে হবে। গ্রামের মানুষের নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। যেখানে সেখানে ঘর-বাড়ি বানিয়ে ফসলি জমি নষ্ট না করে সমবায়ের মাধ্যমে আধুনিক ভবন তৈরি করে দেয়া যেতে পারে, যাতে করে গ্রামের মানুষ নিজস্ব ফ্ল্যাট কিনতে পারে। বঙ্গবন্ধু মডেল ভিলেজে উন্নত মানের ঘরবাড়ি তৈরি করে দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে আরো উন্নত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

ভ্রমণ : সাজেক ভ্যালি

ড. তরুণ কান্তি শিকদার

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ বিকালে বাংলাদেশ বিমানের উড়ানযানে চট্টগ্রাম আসি। বিমানবন্দর থেকে সরাসরি পতেঙ্গা সী বিচ। এই ক'বছরে সী বিচের ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। আগে একটা বেড়ি বাঁধ ছিল তার পাশে ছিল কিছু বোল্ডার ফেলানো। সী বিচের নামাটাও সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু এবার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। বীচের পাশ দিয়ে বাঁধাই করা ঘাট এবং বিস্তীর্ণ এলাকা দুই তিন স্তর বিশিষ্ট বাঁধাই করা হয়েছে চলা ফেরার জন্য। পর্যটকের সংখ্যা ও একেবারে কম নয়। মানুষের চলাফেরার জন্য অঞ্চলটি বেশ মনোগ্রাহি ও আরামদায়ক হয়েছে। কিন্তু বাঙালির চিরায়ত স্বভাব যত্রতত্র ছড়ানো ছিটানো ময়লা আবর্জনা ফেলে পরিবেশ নষ্ট করা। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া আবশ্যক। মানুষকে ইকো-ফ্রেন্ডলি করে তোলা ও সচেতনতা বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি। দৃশ্যমান স্থানে বিন স্থাপন ও সতর্ক বাণী দিতে হবে, নিয়ম ভঙ্গকারীকে করতে হবে জরিমানা। বিশেষ করে দোকানদার শ্রেণি ও হকারদের নিয়ন্ত্রণ করে কাজে লাগাতে হবে। সম্প্রতি সাউথ কোরিয়ার সিউলে একটি সরকারি কাজে গিয়েছিলাম। সেখানে হাংগাং রিভারের পাড় ঘেষে গড়ে ওঠা এমন পর্যটন কেন্দ্রগুলো অবাক করার মতো। সেখানে যত্রতত্র কোন আবর্জনা নেই। প্রত্যেক নাগরিক খাবার উচ্ছিষ্ট চিপস্, খালি বোতল কোনভাবেই নির্দিষ্ট স্থানের বাইরে পরিত্যাগ করছে না। ছোট শিশুদের দেখেছি, খাবার উচ্ছিষ্ট ফেলার জন্যে ডাস্টবিন খুঁজছে। নির্ধারিত ডাস্টবিনের বাইরে কেউ কোন ময়লা ফেলছে না। অথচ আমাদের দেশে শিশু থেকে পূর্ণ বয়স্ক মানুষ শিক্ষিত অশিক্ষিত কারো মাঝে কোন বোধোদয় নেই। যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলতেই আমরা অভ্যস্ত। শিশু বয়সে স্কুল কলেজ থেকে এবং পারিবারিকভাবে গড়ে না তুললে এই মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। যত্রতত্র ময়লা ফেলা যে অপরাধ এটা আমরা

প্রজন্মান্তরে শেখাতে ব্যর্থ হয়েছি। ব্যর্থ হয়েছি আইনের যথার্থ প্রয়োগ করতে। একই সাথে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানকে আইনের আমলে আনা আবশ্যক। আমি পরিবেশ অধিদপ্তরে পরিচালক থাকাকালে মহাপরিচালককে একটি প্রস্তাব দিয়েছিলাম। পলিথিন বা পলিপ্রোইলিন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে বাধ্যতামূলকভাবে একটি রিসাইকেল প্লান্ট করতে হবে। যেখানে তাকে তার উৎপাদিত বর্জের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ রিসাইকেল করতে হবে। ধরুন, যদি একটি পলিব্যাগ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বছরে ১০০ টন পলিব্যাগ উৎপাদন করে তাহলে ঐ প্রতিষ্ঠানকে বছরে ২৫ টন পলিব্যাগ বাধ্যতামূলকভাবে রিসাইকেল করতে হবে। তাহলে বাজারে বর্জের একটি নির্ধারিত মূল্যমান ও চাহিদা থাকবে। ব্যবহারকারী সামান্য মূল্য পেলেও সংরক্ষণ করে খুচরা ব্যবসায়ীকে দিবেন। এ থেকে আরো এক শ্রেণির মানুষের কর্মসংস্থান হবে। পরিবেশের জন্য ক্ষতি কম হবে। সিটি কর্পোরেশনগুলোর কনজারভেন্সি ব্যয় কমবে। কিন্তু মহাপরিচালক মহোদয় আমার সে প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। সরকার চাইলো সহজলভ্য ও পলিব্যাগের পর্যাপ্ত বিকল্প না দিয়ে পলিব্যাগের উৎপাদন ও ব্যবহার বন্ধ করতে। ফল যা হবার তাই হলো ব্যর্থতা। শত শত টন পলিব্যাগ জব্দকরে তা আগুনে পুড়িয়ে বা কেটে নষ্ট করা হলো। পলিথিন কাটার জন্য প্রত্যেক অফিসকে ১৮-২০ হাজার টাকা ব্যয় করে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত মেশিন কেনা হলো। যা কয়েক দিনের মধ্যে অকার্যকর হয়ে পড়লো। উৎপাদক প্রতিষ্ঠানকে কোটি কোটি টাকা জরিমানা করা হলো কিন্তু ব্যবসা বা উৎপাদন ও ব্যবহার কোনক্রমে বন্ধ হলো না। আসলে বিকল্প ছাড়া উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা ছাড়া কোন আইনই বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এজন্য চাই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। উদ্যোক্তা সৃষ্টি করে তাদের প্রণোদনা দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু আমাদের দেশে সরকারি প্রণোদনা দিলে তা কার্যকরী হয় না। ক্ষেত্রবিশেষে এক শেণির মানুষের জন্য লুটপাটের মহোৎসবে পরিণত হয়।

যা হোক, পতেঙ্গা সী বিচ, কর্ণফুলী টানেল, বে-টারমিনাল ও শহরের মধ্যে নির্মিতব্য ফ্লাইওভার কার্যক্রম পরিকল্পনামাফিক শেষ হলে এ অঞ্চলের পরিবেশের দৃশ্যমান ব্যাপক পরিবর্তন আসবে। কিন্তু পরিবেশের উন্নয়নের পাশাপাশি প্রতিবেশের উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আবার তা ভাগাড়ে পরিণত হতে বেশী সময় লাগবে না। বাংলাদেশের সিটি কর্পোরেশনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ব্যস্ততম শহর চট্টগ্রাম। এটি বর্তমান বাংলাদেশের অন্যতম বাণিজ্যিক হাব। কিন্তু পরিচ্ছন্নতার মান ও যানজট অসহনীয় পর্যায়ে। একে গড়ে তোলা শুধু নগর পিতার একার দায়িত্ব নয়। আমাদের সবার দায়িত্ব। সেই ধরণের যোগ্য উত্তরসুরী গড়ে তুলতে হবে। পারিবারিক শিক্ষায় আমুল পরিবর্তন আনতে হবে।

সী-বীচ ঘুরে রাতে সিএমপি পুলিশ অফিসার্স মেস-এ রাত্রি যাপন। সার্কিট হাউজের বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে বেশ ভালোই আবাসন ব্যবস্থা। রাতে বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সাথে সরকারি আলাপন ও কিছু পরিদর্শন শেষে রাত্রিযাপন।

২০ ফেব্রুয়ারি সকাল ৮.৫১ টায় সাজেক ভ্যালি দর্শনের উদ্দেশ্যে খাগড়াছড়ির পথে যাত্রা শুরু হলো। খাগড়াছড়িতে ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে চাকরির শুরুতে বিএমএ ট্রেনিং এর অংশ হিসেবে একবার এসেছিলাম। তখন শান্তি বাহিনীর সাথে সরকারের বিরোধ তুঙ্গে। প্রতিদিন খণ্ডযুদ্ধ হামলা লেগেই থাকতো। তাই সিভিল অফিসারদের জন্য ভ্রমণ মোটেই সুখকর ছিল না। প্রশিক্ষণেও প্রথম দিকে বেশ তিক্ততা ছিল। সরকারি উদ্দেশ্য ছিল সেনা ও সিভিল কর্মকর্তাদের মাঝে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটানো। কিন্তু প্রথমদিকে সেনা কর্মকর্তাদের উন্নাসিক মনোভাব সিভিল কর্মকর্তাদের উপর হামবড়া ভাব দেখানোটা মোটেও পছন্দনীয় ছিল না। এই বৈরী পরিবেশের কারণে প্রশিক্ষণরত অবস্থায় একজন কর্মকর্তার আত্মহত্যা শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি পাল্টে দেয়। পরবর্তীতে প্রশিক্ষণগুলো আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে। সে সময় বিএমএ ট্রেনিং-এর মাঠ পরিদর্শনে মহালছড়ি উপজেলায় আসি। আসার পথে ঘটে যায় আর এক বিভ্রাট। গুইমারা আর্মি ক্যাম্প পার হরে হঠাৎ আমাদের জিপটি দুর্ঘটনায় পড়ে। আমরা ৬ জন জিপের পিছন থেকে ছিটকে পাহাড়ের উপর পড়ি। সৌভাগ্যবশতঃ কোন ক্ষতি হয়নি। পরে আমাদের পথিমধ্যে গুইমারা আর্মি ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয় এবং দুর্ঘটনার পুরস্কার স্বরূপ ফিস ফিঙ্গার, চিকেন ফ্রাই, কোল্ড ড্রিংকসসহ উত্তম নাস্তা করানো হলো। এই পাহাড়ী পরিবেশে যা প্রত্যাশার অতিরিক্ত ছিল।

সর্পিল উঁচু নিচু পাহাড়ী রাস্তায় দুর্বার গতিতে গাড়ি ছুটে চলেছে খাগড়াছড়ির উদ্দেশ্যে। চালক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের আব্দুল মাবুদ। দুপাশে নয়নাভিরাম দৃশ্য। শীতের শেষে যদিও পাহাড়ে সবুজ রঙে চিড় ধরেছে। পত্ররাজি হলুদাভবর্ণ ধারণ করে জীবনাবসানের পূর্বের শেষ দূত্যির বিচ্ছুরণ ছড়াচ্ছে। কোথাও বিস্তর শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনি মনোজগতে জীবনের চরম সত্যের জানান দিয়ে যাচ্ছে। গভীর অরণ্যের পাশ দিয়ে সাদা কাঁশফুল বাতাসের সামান্য দোলায় উড়ে যাচ্ছে দূর দিগন্ত। কোথাও পতিত হলেই সাথে থাকা বীজ নতুন বংশ বিস্তারের সুযোগ গ্রহণ করবে। এই পার্বত্য অঞ্চলের আর একটি বিশেষ ঘাসফুল পরিপক্ক হলে তা তুলে গুচ্ছ গুচ্ছ আটি বেঁধে সারাদেশে বিক্রয় হচ্ছে। দশ থেকে ১২ টি ফুলের দণ্ডগুচ্ছ স্থানীয় মূল্য ২০ টাকা। প্রান্তিক ভোক্তার কাছে স্থানভেদে ১০০-১২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে ফুলঝাড়ু নামে। এগুলো প্রতিদিন সকালে গৃহ পরিচ্ছন্নতার অন্যতম উপাদান। স্থানীয় আদিবাসী মহিলা পুরুষ গভীর বন থেকে বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঘেটে ফুলগুলো সংগ্রহ করে ২০ টির একটি আটি বেঁধে রাস্তার পাশে রেখে দিয়েছে। কাঁচা অবস্থায় ফুলগুলো তার শেষ শোভা বিস্তার করছে। আর ক'দিন পরেই এই সুন্দর ফুলগুলো নোংরা পরিস্কারের কাজে ব্যবহৃত হবে।

চালকের দ্রুতগতির কারণেই আমরা নির্ধারিত সময়ের আগেই খাগড়াছড়ি জেলার প্রবেশ দ্বারে উপনীত হলাম। প্রবেশদ্বার বলতে আলুটিলা পাহাড়। এই ৩০ বছরে আলুটিলা তার রূপ পরিবর্তন করে অপ্সরা রূপে সেজেছে। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে হয়েছে সুদৃশ্য তোরণ। পাহাড়ের

রূপ দর্শনের জন্য তৈরী হয়েছে পাদপ। অন্য আরো বেশ কিছু চলমান উন্নয়নমূলক কাজ দৃষ্টিগোচর হলো। যেখানে ১৯৯২ সালে শুধু একটা সাদাকালো সাইনবোর্ডে লেখা ছিল "আলুটিলা পাহাড়"। তার নিচে তৎকালীন জেলা প্রশাসকের একটি চার লাইনের কবিতার পংক্তি, (স্মৃতি থেকে নেওয়া হয়তো দু'একটি শব্দ ভুল হতে পারে)

"ক্লান্ত পথিক ক্ষণেক বসিও আলুটিলা বটমূলে
নয়ন ভরিয়া দেখিও আমায় চেঙ্গি নদীর কূলে।"

নিচে লেখা জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি।

তখন জেলা প্রশাসকের মুখ থেকে কাব্য প্রকাশ, কাব্যরসিকদের কাছে কিছুটা হাস্যরসের সৃষ্টি করতো। এখানে প্রায় ২০০ ফুট নিচে একটি গুহা রয়েছে। আমার সঙ্গী দুই এ্যাডভেঞ্চারিস্ট স্ত্রী ও পুত্র গুহায় প্রবেশের জন্য জুতা খুলে একেবারে প্রস্তুত। গুহাটিও বেশ লম্বা। প্রায় ১০০০ ফুট দৈর্ঘ্য গ্রাহানাইট পাথরের ফাঁক গলে বর্ষায় দ্রুতগতির পানি প্রবাহ সৃষ্টি হয়। এখন যদিও পানি নেই। সামান্য তিরিতিরি পানি প্রবাহ আছে। অন্ধগুহার মধ্যে খুব সন্তর্পণে মোবাইলের মৃদু আলোয় পার হয়ে এলাম গুহা থেকে। জলের মাঝে ছোট একটা কাঁকড়ার দেখা মিললো। তাকে ধরতেই বেচারা ভয় পেয়ে দুটো আঙ্গুল দিয়ে সপাটে কামড় বসিয়ে দিয়ে কামড়যুক্ত হাতটি রেখেই পলায়ন করলো। আমি তার মরা হাতটি থেকে এই শীতের কামড়ে নিজের হাতকে মুক্ত করলাম। মনে মনে কাঁকড়ার ফেলে যাওয়া হাতটির জন্য কষ্ট পেলাম। গুহার মধ্যে হিমশীতল পাথরের ঠান্ডায় পা বেশ আড়ষ্ট হয়ে গেল। একটা মজার অনুভূতি নিয়ে বেরিয়ে এলাম। যদিও পর্বতের তলদেশ দিয়ে এর থেকে অনেক বড় গুহায় ঢোকার অনুভূতি আমার আগেই ছিল। তন্মধ্যে ভিয়েতনামের হালংবিচ, চীন, মালয়েশিয়া ও ভারতের অভিজ্ঞতা অন্যতম। যাক সময়ের সুতো টান টান ভাবে চলছিল। আমার জন্য খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে সহকর্মীরা অবস্থান করছেন তাদের সাথে নির্ধারিত মিটিং এ অংশ নিতে হাজির হলাম।

সভা শেষ করে মধ্যাহ্ন ভোজের পর রাঙামাটির সাজেক ভ্যালির দিকে যাত্রা শুরু। যত সামনে যাওয়া যায় পথ তত দুর্গম সর্পিল ও উঁচু নিচু ধাপ অতিক্রম করতে হচ্ছে। তবে দক্ষ চালক ও অসাধারণ সুন্দর রাস্তা চলার কষ্টকে বেশ লাঘব করে দিলো। খাগড়াছড়ি থেকে দুই ঘন্টার মধ্যে সাজেক পৌঁছে গেলাম। সাজেক সম্পর্কে আমার ধারণা একেবারেই কম। কিভাবে যাওয়া যায় কত দূরের পথ। থাকার ব্যবস্থা কি এসব কিছুই জানিনা। আমার ধারনা ছিল অঞ্চলটি খুবই দুর্গম এবং এখনো সামরিক বাহিনীর সহযোগিতা ছাড়া যাওয়া সম্ভব নয়। এজন্য পরিবারের সবার আগ্রহ থাকলেও সাজেক ভ্রমণে আমার অনাগ্রহই প্রকট ছিল। তবে এখানে এসে সেই ভুল ভেঙ্গে গেল। তাই সহকর্মী লে. কর্নেল রেজাকে অনুরোধ করেছিলাম একটা থাকার ব্যবস্থা করতে। তিনি একটা রুম রিজার্ভ করে রেখেছিলেন। যদিও আজকাল অন লাইনে সব তথ্যই আছে। কিন্তু ব্যস্ততার জন্য কিছুই দেখা হয়নি।

সাজেকের বর্ণনা

লুসাইহিলস বা মিজোহিলস ভারতের মিজোরাম ও ত্রিপুরা অন্তর্গত পাহাড়টি পাটকাই (উত্তর-পূর্ব ভারত ও মায়নামারের সীমান্তে অবস্থিত পর্বতমালা) পর্বতশ্রেণির অংশ এবং এর সর্বোচ্চ বিন্দু 'ফাউংপুই'-এর উচ্চতা ২,১৫৭ মিটার (৭৩৩৪ ফুট)। যা 'নীল পর্বতমালা' নামেও পরিচিত। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোকেরা এখানে বসবাস করে। পাটকাই পর্বত অসম, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড ছাড়াও মায়নামার পর্যন্ত বিস্তৃত। পাটকাই পর্বত থেকে অসমের বুড়িদিহিং ও নদিহিং নদীর উৎপত্তি হয়েছে। এই পর্বতমালার নিম্নাংশ নিয়ে গঠিত বিভিন্ন পর্বত উপত্যকার অংশবিশেষ সাজেক উপত্যকা।

সাজেক উপত্যাকা বাংলাদেশের রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাই ছড়ি উপজেলার অন্তর্গত সাজেক ইউনিয়নের একটি বিখ্যাত পর্যটন স্থল। রাঙামাটির একেবারে উত্তরে অবস্থিত এই সাজেক ভ্যালিতে রয়েছে দুটিপাড়া রুইলুই এবং কংলাক পাড়া। ১৮৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত রুইলুই পাড়া ১,৭২০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। আর কংলাক পাড়া ১,৮০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। সাজেকে মূলত লুসাই, পাংখোয়া এবং ত্রিপুরা উপজাতি বসবাস করে। রাঙামাটির অনেকটা অংশই দেখে যায় সাজেক ভ্যালি থেকে। এই জন্য সাজেক ভ্যালিকে 'রাঙামাটির ছাদ' বলা হয়। কর্ণফুলী নদী থেকে উদ্ভূত সাজেক নদী থেকে সাজেক ভ্যালির নাম এসেছে।

সাজেক ভ্যালি রাঙ্গামাটি জেলার সবচেয়ে উত্তরে হওয়ায় খাগড়াছড়ি জেলা সদর থেকেই সাজেক যাওয়ার সহজ পথ। খাগড়াছড়ি থেকে সাজেকের দূরত্ব প্রায় ৭০ কিলোমিটার। আর দীঘিনালা থেকে প্রায় ৪৯ কিলোমিটার। সাজেকের উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা, দক্ষিণে রাঙামাটির লংগদু, পূর্বে ভারতের মিজোরাম, পশ্চিমে খাগড়াছড়ি দীঘিনালা অবস্থিত। সাজেক ইউনিয়ন হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ইউনিয়ন; যার আয়তন ৭০২ বর্গমাইল।

সাজেকে সর্বত্র মেঘ, পাহাড় আর সবুজের ছড়াছড়ি। এখান থেকে পাহাড়ের উপর দিয়ে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত দেখা যায়। সাজেকের রুইলুই পাড়া থেকে ট্র্যাকিং করে কংলাক পাড়ায় যাওয়া যায়। কংলাক হচ্ছে সাজেকের সর্বোচ্চ চূড়া। কংলাকে যাওয়ার পথে মিজোরাম সীমান্তের আদিবাসীদের জীবনযাপনের চিত্র এবং চারদিকে মেঘের আনাগোনা দেখা যায়।

সাজেক ভ্যালি যাওয়ার সহজ পথ

ঢাকা থেকে সরাসরি বিমান, রেল বা বাস যোগে চট্টগ্রাম হয়ে আপনাকে যেতে হবে খাগড়াছড়ি। সেখান থেকে চাঁন্দের গাড়ি রিজার্ভ নিয়ে একদিনে সাজেক ভ্যালি ঘুরে আসা যায়। ভাড়া ৫০০০-৬০০০ টাকা। এক গাড়িতে ১৫ জন পর্যন্ত যাওয়া যায়। লোক কম হলে শহর থেকে সিএনজি নিয়েও যাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে ভাড়া ৩০০০ টাকার মতো অথবা খাগড়াছড়ি শহর থেকে দীঘিনালা গিয়েও সাজেক যাওয়া যেতে পারে। বাস যোগে গেলে দীঘিনালা থেকে জনপ্রতি ৪৫ টাকা এবং মোটর সাইকেলে জনপ্রতি ভাড়া ১০০ টাকা। দীঘিনালা থেকে ১০০০-১২০০ টাকায় মোটর সাইকেল রিজার্ভ নিয়েও সাজেক ঘুরে আসা যায়। তবে ফেরার সময় অবশ্যই সন্ধ্যার আগে আপনাকে চলে আসতে হবে।

আবাসন ব্যবস্থা

মেঘের রাজ্য সাজেকে যাওয়ার কথা চিন্তা করলেই, সবার প্রথমে মাথায় আসে কোথায় থাকবেন। পাহাড় ঘেরা এই নির্জনে এক রাত কাটানোর অবকাশ আছে তো? এ প্রশ্ন মাথায় আসতেই পারে। তবে একটা কথা বলে রাখা ভালো সাজেক বেড়ানোর জন্য এক রাতের অবস্থানই ভালো। কারণ সাগর ও পাহাড় আমার কাছে অল্প সময়ের জন্যই ভালো লাগে। বেশী সময় থাকলে মজা ফুরিয়ে যায় এবং একঘেয়ে মনে হয়। তাই এক রাত দু'দিনের জন্য পরিকল্পনা করে যাওয়াই উত্তম বলে মনে হয়। আর এজন্য গড়ে উঠেছে মনপছন্দ নানা রকম রিসোর্টের। কোনো রিসোর্টে আছে ঝুল বারান্দা? কোন রিসোর্ট থেকে উপভোগ করা যায় মেঘ রোদের খেলা। এছাড়া কোথাও বিছানায় শুয়ে দূর পাহাড়ে মেঘ আর রোদের খেলা দেখা গেলেতো কথাই নেই। আপনার ট্যুর হবে ষোলো আনায় পূর্ণ। এবার একনজরে দেখে নেওয়া যাক সাজেকের থাকার ব্যবস্থাপনা।

লুসাই রিসোর্ট এন্ড হেরিটেজ ভিলেজ

সাজেকে যত রিসোর্ট আছে তার মধ্যে সবচেয়ে ব্যতিক্রম 'লুসাই রিসোর্ট এন্ড হেরিটেজ ভিলেজ'। পাহাড়ি লুসাই সম্প্রদায়ের বাড়িঘর ও গ্রামের আদলে গড়ে তোলা হয়েছে একটি আর্টিফিসিয়াল গ্রাম যার নাম লুসাই গ্রাম। এই ঐতিহ্যবাহী গ্রামে দৃষ্টিনন্দন সব কটেজ ছাড়াও রয়েছে মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশ। লুসাই সম্প্রদায়ের মানুষেরা যেরকম ঘরে থাকেন তার আদলে গড়ে তোলা হয়েছে এই রিসোর্টের কটেজগুলি। আদিবাসীদের সামাজিক ব্যবস্থাপনা ও জীবন যাত্রার অপূর্ব এক সমন্বয় দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে এর মধ্যে। বাঁশ, ছন, কাঠ দিয়ে তৈরি কটেজগুলো বাইরে থেকে দেখতে খুবই সুন্দর। তেমনি এর ভেতরে সংযুক্ত করা হয়েছে সব রকম আধুনিক সুযোগ-সুবিধা।

লুসাই গ্রামের গেট দিয়ে ঢোকার পরপরই চোখে পড়বে একটি ট্রি হাউজ বা গাছ ঘর। দেখে মনে হবে যেন গাছ ফুঁড়েই বের হয়েছে এই ঘরটি। মই বেয়ে উপরে উঠে এই রুমের ভেতর থেকে বাইরে তাকালেই চোখে পড়বে পাহাড়ের চমৎকার দৃশ্য। এখান থেকে পুরো গ্রামটাই দেখা যায়। বাঁশের বেড়া দিয়ে আবৃত এই গাছ ঘরে থেকে আপনার মনে হবে আপনি পাহাড়ে বাস করা মানুষদেরই একজন। আধুনিক সুবিধা সম্পন্ন এই কাপল রুমে এক রাতের জন্য থাকতে হলে আপনাকে খরচ করতে হবে চার হাজার টাকা।

লুসাই ভিলেজে একটি স্পেশাল কাপল কটেজ রয়েছে, যার নাম 'উডেন হাউজ'। এই কটেজের বারান্দা থেকে খুবই চমৎকার ভিউ পাওয়া যায়। পরিপাটি বিছানা, চমৎকার বারান্দা, আধুনিক টয়লেটসহ এই কটেজে কাপল অথবা সর্বোচ্চ চারজন পর্যন্ত থাকতে পারবেন। এর জন্য খরচ হবে চার হাজার টাকা।

লুসাই গ্রামে থাকার জন্য আরো কিছু অপশন আছে। যেগুলোকে লুসাই ঘর বলা হয়। এই ঘরগুলোও লুসাইদের বাড়ির আদলে তৈরি। এই কটেজেগুলোতেও কাপল অথবা সর্বোচ্চ চারজন পর্যন্ত থাকা

যায়। যার বারান্দায় বসে আড্ডা দিতে দিতে উপভোগ করতে পারবেন সাজেকের মন-মাতানো দৃশ্য। ভোরে ঘুম থেকে উঠেই পরশ পাবেন ঠান্ডা ঠান্ডা মেঘের। এ কটেজে থাকতে হলে আপনাকে গুণতে হবে তিন হাজার টাকা।

কটেজগুলোর প্রতিটির আশপাশেই করা হয়েছে ফুলের বাগান। পুরো রিসোর্টটিই গাছগাছালিতে ঘেরা। যার ফলে এখানে গেলে পাওয়া যাবে মানসিক প্রশান্তি। হলুদ সূর্যমূখী ফুলের সাথে লাল-গোলাপী নানা ফুলের সৌরভ আপনাকে কিছু সময়ের জন্য ভুলিয়ে দিবে শহুরে যান্ত্রিক রোজগেরে জীবন।

রিসোর্টের পাশাপাশি এখানে লুসাইদের ব্যবহৃত বাড়ি বা ঘরের মডেল তৈরি করে রাখা হয়েছে। যার ভেতরে লুসাই সম্প্রদায়ের মানুষদের ব্যবহৃত জিনিসপত্রের মডেল রাখা আছে। যেগুলো দেখে তাদের ঐতিহ্যগত পরিচিতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

এই রিসোর্টে না থাকলেও সাজেকে বেড়াতে এসে শুধু ঘুরে দেখার জন্যও এই গ্রামে প্রবেশ করা যায়। এখানকার প্রবেশমূল্য মাত্র ৩০ টাকা। লুসাই হেরিটেজ ভিলেজের একটা চমৎকার আয়োজন হলো এখানে লুসাইদের পোশাক পাওয়া যায়। যা আপনি ১০০ টাকার বিনিময়ে ভাড়া নিতে পারবেন। এই পোশাক পরে গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে ছবিও তুলতে পারবেন। কিছু সময়ের জন্য আপনিও হয়ে যেতে পারেন লুসাই রাজা অথবা রানী। লুসাই গ্রামে প্রবেশ গেটের পাশেই রয়েছে একটি টি-স্টল। গ্রামে ঘোরাঘুরি শেষে যেখানে বসে আপনি উপভোগ করতে পারবেন সাজেকের ভুবন ভুলানো ব্যাম্বু-টি। সব কিছু মিলিয়ে এই লুসাই হেরিটেজ ভিলেজ আপনার সাজেক ট্যুরকে করে তুলবে আনন্দদায়ক ও মেমোরেবল।

সাজেক রিসোর্ট

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পরিচালিত রিসোর্ট সাজেক রিসোর্ট। যার দ্বিতীয় তলায় চারটি কক্ষ আছে। খাবারের ব্যবস্থা আছে। এই রিসোর্টের নন এসি রুমগুলোর ভাড়া ১০,০০০- ১৫,০০০ টাকা। সেনাবাহিনিতে কর্মরত বা প্রথম শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড়। যোগাযোগ: ০১৮৫৯০২৫৬৯৪ অথবা ০১৮৪৭০৭০৩৯৫।

আলো রিসোর্ট

এটি সাজেকের একটু আগে রুইলুই পাড়াতে অবস্থিত। এটিতে মোট ৬ টি রুম আছে। ডাবল রুম ৪ টি প্রতিটিতে ২টি খাট। কাপল রুম ২ টি। যোগাযোগ: ০১৮৬৩৬০৬৯০৬ অথবা ০১৩৭১-৬২০৬৭।

রুণময় রিসোর্ট

এই রিসোর্টে মোট ৫ টি রুম রয়েছে। প্রতিটি কক্ষে ২ জন থাকতে পারবেন। নিচ তলার রুম ভাড়া ৪৪৫০ টাকা। প্রতিটি কক্ষে ২ জন থাকতে পারবেন। ৬০০ টাকা দিয়ে অতিরিক্ত বেড নিতে পারবেন। উপরের তলায় দুজন করে থাকার দুইটি কক্ষ রয়েছে, ভাড়া ৪৯৫০ টাকা। যোগাযোগ: ০১৮৬৫৪৭৬৮৮।

মেঘ মাচাং

মেঘ মাচাং রিসোর্ট অনেকের পছন্দের শীর্ষে। কারণ, সুন্দর ভিউ ও তুলনামূলক কম খরচে থাকা যায় এখানে। আছে খাবারের ব্যবস্থা। মেঘ মাচাং-এ পাঁচটি কটেজ আছে। ভাড়া ২৫০০-৩৫০০ টাকা। যোগাযোগ: ০১৮২২১৬৮৮৭৭।

লুসাই কটেজ

কাপল রুম, ডাবল বেডসহ আছে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা। সুন্দর ডেকোরেশন ও ভালো ল্যান্ডস্কেপিক ভিউয়ের এই কটেজের রুমের ভাড়া ২০০০-৩০০০ টাকা। যোগাযোগ: ০১৬৩৪১৯৮০০৫।

মেঘপুঞ্জি রিসোর্ট

সুন্দর ইকো সাজসজ্জা ও আকর্ষণীয় ল্যান্ডস্কেপিক ভিউসহ মেঘপুঞ্জিতে আছে ৪টি কটেজ, প্রতিটিতে ৩-৪ জন থাকা যাবে। ভাড়া ২৫০০-৩৫০০ টাকা। যোগাযোগ: ০১৮১৫৭৬১০৬৫।

ঝিঁ ঝিঁ পোকার বাড়ি

নামটাই কী অদ্ভুত সুন্দর। চার রুমের এই কটেজে রুম প্রতি ভাড়া ২০০০-২৫০০ টাকা। যোগাযোগ: ০১৮৬৯১৫৭৬৬৬।

ম্যাডভেঞ্চার রিসোর্ট

রিসোর্টটির ল্যান্ডস্কেপিক ভিউ অসাধারণ। কাপল রুম সিঙ্গেল বেড ২০০০ টাকা, ডাবল বেড- ২৫০০ টাকা। যোগাযোগ: ০১৮৮৫৪২৪২৪২।

রুইলুই পাড়া ক্লাব হাউজ

এটি সাজেকের একটু আগে রুইলুই পাড়াতে অবস্থিত। এখানে ১৫ জনের মত থাকতে পারবেন। ভাড়া জনপ্রতি ১০০-২০০ টাকা করে দিতে হবে। নিজেরা রান্না করে খেতে পারবেন। এর কেয়ার টেকার মইযা লুসাই দাদা সব ব্যবস্থা করে দিবে। লক্ষণ নামেও একজন আছে, প্রয়োজনে আপনাদের সহযোগিতা করবে। এখানে দুইটা টয়লেট আছে। একটি ফ্রি ব্যবহার করতে পারবেন। অন্যটির জন্য ২০০ টাকা প্রদান করতে হবে। যোগাযোগ: ০১৮৬০১০৩৪০২ অথবা ০১৮৩৮৪৯৭৬১২।

আদিবাসী ঘর

কম খরচে থাকতে চাইলে আদিবাসিদের ঘরেও থাকতে পারবেন। জনপ্রতি ২০০-৩০০ টাকায় থাকা যাবে। ফ্যামিলি বা কাপল থাকার জন্যে আদর্শ না হলেও বন্ধু বান্ধব মিলে একসাথে থাকা যাবে।

উপরে রিসোর্ট এবং কটেজগুলো নিয়মিত ভাড়ার পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। শুক্র-শনিবার, ঈদ এবং বিভিন্ন বিশেষ ছুটির দিন ইত্যাদি সময়ভেদে ভাড়ার পরিমাণ কমবেশি হতে পারে। আবার অনেক সময় পর্যটকের আনাগোনা কম থাকলে রিসোর্টগুলোতে কিছুটা ছাড়ের সুবিধা পাওয়া যায়। তবে সকলক্ষেত্রে রিসোর্ট বা কটেজ ঠিক করতে একটু দরদাম করে নেয়া ভালো।

ফেরার সময় হাজাছড়া ঝর্ণা, দীঘিনালা ঝুলন্ত ব্রিজ ও দীঘিনালা বনবিহার দেখে

আসতে পারেন। একদিনে এই সব গুলো দেখতে হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে পড়বেন। আরেকটি মজার বিষয় হল খাগড়াছড়ির সিস্টেম রেস্তোরায় ঐতিহ্যবাহী খাবার খেতে ভুলবেন না কিন্তু।

ফিরে আসি নিজের কথায়। বিকেল ৫.৩০ নাগাদ আমরা সাজেক ভ্যালিতে প্রবেশ করলাম। চারদিকে কুয়াশার মৃদু আভাষ। সূর্যদেব পাটে বসেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে লাল আভা বিতরণ করতে করতে সূর্য অন্তর্হিত হলেন। সূর্যাস্তের ছবি তুলতে ব্যস্ত একদল পর্যটক হেলিপ্যাড জুড়ে মহাসমারহে কলরব করছে। ডিজিটাল যুগে ছবি তোলার কোন খরচা নেই। যত খুশী পার ছবি তোল শুধু অপছন্দের ছবিগুলো অলস সময়ে ডিলেট করলেই হলো। আমাদের ছাত্রজীবনে ফিল্মের ক্যামেরাই ছিল ভরসা। একটি রিলে ৩৫/৩৬ টা ছবি উঠতো দাম স্থানভেদে ১২০-১৫০ টাকা ছিল। পর্যটন কেন্দ্রগুলোর কাছাকাছি অসাধু বিক্রেতাগণ আবার রঙিন ফুজি বা কোডাক ফিল্মের মোড়কে সাদাকালো রিল ঢুকিয়ে বিক্রি করতো। ধরার কোন উপায় ছিলনা ওয়াশ করার পূর্বে। কিন্তু ওয়াশ করার পর আর কিছুই করার থাকে না। আমি নিজেও একবার ভাওয়াল ন্যাশনাল পার্কে এই প্রকার প্রতারণার ফাঁদে পড়েছিলাম। আমার টিমে ছবি তোলার আগ্রহ একজনেরই। বিভিন্ন ভঙ্গিমায় নব নব ড্রেসে আমার একমাত্র সহধর্মীনি। তার যত আগ্রহ ক্যামেরাম্যানের ততটাই অনাগ্রহ। তিনি হলে শ্রীমান প্রীতম তাঁরই একমাত্র সুপুত্র। একই জায়গায় একের অধিক ছবি তুলতে রীতিমত তার হাত ব্যাথা করে মনে হয়। শেষ পর্যন্ত প্রিয়তমা বিদুষী স্ত্রীর মনোবাসনা পূর্ণ করতে আমাকেই মোবাইল ধরতে হয়। এভাবে ছবি তোলার পালা শেষ করে পুর্ব নির্ধারিত হোটেল 'রুনময়'-এ আশ্রয় গ্রহণ।

অসীম নীল আকাশ, দুরন্ত শুভ্র মেঘ, এক গুচ্ছ মৌনী পাহাড় আর ছন্দময় চির হরিৎ উপত্যকার অপরূপ সৌন্দর্যের নীলাভূমি সাজেক পর্যটন কেন্দ্র পর্যটকদের নিরাপদ আবাসন 'রুনময়'। স্থানীয় লুসাই ভাষায় এই শব্দটির আক্ষরিক অর্থ সুন্দর ঘর। ওভাল শেপ-এ মূল পাহাড়ের উপর প্রধান সড়কের সাথে পূর্ব ও পশ্চিমমুখী দ্বিতল ভবন। রুনময় রিজিয়ন অফিসার্স ক্লাব, খাগড়াছড়ির সামরিক বাহিনীর সমস্যদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। মাত্র ৮টি রুম আমাদের রুমটি নিচ তলায় হওয়ায় সবার মন খারাপ। খুব বেশী সুযোগ সুবিধা না থাকলেও এ পাহাড়ি জনপদে মোটামুটি দু'রাত কাটানোর জন্য যথেষ্ট বলেই মনে হলো। কটেজটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট হলো সকালে পাহাড়ের তলদেশ থেকে সূর্যের লাল আভা যেমন আস্তে আস্তে ভেসে উঠে আপনার মন প্রাণ ভরিয়ে দেবে। তেমনি বিকালে গোধুলিলগ্নে আবার পাহাড়ের সবুজের চাদরের নিচে সূর্যদেব শেষ আলোকরশ্মি বিতরণ করতে করতে নিস্প্রভ হয়ে মিলিয়ে যায় গাঢ় অন্ধকারে। আস্তে আস্তে পাখিরা সব নীড়ে ফেরে। রাত জাগানিয়া পাখিরা ও নিশাচর শ্বাপদের ঘুরে ফেরে গভীর অরণ্যের পথে। যার যার ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণের জন্য। একটু অন্ধকার হতেই চারদিক থেকে ঝিঁ ঝিঁ পোকার চিহি চিহি গানের সুর আপনাকে মুগ্ধ করে দিবে। আর যদি শুক্লপক্ষে আপনার আগমন ঘটে তাহলে পূর্ণিমার আলোকবন্যায় আপনি

ভেসে যেতে পারেন স্বপ্নীল কল্পনার রঙিন আলোয়। পাহাড়ে দেখার আর কি বা আছে। সুউচ্চ উত্তুঙ্গ পাহাড় গ্রাহানাইড, পাললিক বা বেলে পাথরের ডিবি। কোথাও পাথরের বুক চিরে বেরিয়ে আসা সবুজের গাঢ় আবরণের মোহময়তা আবার কোথাও পাহাড়ের বুক চিরে বেরিয়ে আসা কান্নার অমিত ধারা যা ঝর্ণার প্লাবন। এই মোহময়তা আমাদের বার বার আকৃষ্ঠ করে। নিয়ে যায় এক স্বপ্নীল আবেশে ভালোলাগা ও ভালোবাসার আবহে।

যাহোক, আমরা উচ্ছাস আর আবেগের সাথে হেলিপ্যাড ও পাহাড়ের নানা ছবি তোলা শেষ করে কটেজ রুনময়-এ উঠলাম। শেষ বিকেলে রুনময় অপার সৌন্দর্যের লীলাভুমি। রবির রক্তিম আভা সবুজের আস্তরণের উপর দিয়ে শেষ আলোক রশ্মি বিকিরণ করতে করতে অস্তাচলে পাঠ নিয়েছে। অদূরে মাথার উপর রূপালী চাঁদ উকিঁ দিচ্ছে তার কোমল আভা ছড়িয়ে এই মায়াবী রাতকে আরো মোহময় করে তুলতে। গোধুলির এই মোহময়তা কাটিয়ে আমরা আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তার পাশে স্ট্রিট ফুড এর মেলা বসেছে। হরেক রকমের তেলে ভাজা পিঠাও খাবার সামগ্রী। দেখে জিহ্বায় জল এসে যায়। কিন্তু অপরিচ্ছন্নতা বাঙালির চিরায়ত অভ্যাস তাই হিসাব করে খাবার গ্রহণ করতে হলো এছাড়া করোনা ভীতিকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দাম মোটামুটি সহনশীল। দোকানদারদের বেশীরভাগই স্থানীয় নয়। চট্টগ্রাম, নোয়াখালীর বিভিন্নস্থান থেকে এসে জুড়ে বসেছে। নাস্তা শেষ করে বিশেষ আকর্ষণ বাঁশ চা। পাঠক ভয় পাবেন না বাঁশ চা বলতে বাশেঁর ফুল দিয়ে বানানো চা নয় একটি সদ্য কাটা কাঁচাবাঁশের পেয়ালা কয়লার আগুনের মধ্যে আস্তে আস্তে জল ভরে গরম করা হচ্ছে। জল গরম হলে তার মধ্যে কফি বা টি ব্যাগ দিয়ে একটু শর্করা যোগে প্রস্তুত হচ্ছে লোভনীয় বাঁশচা। আসলে স্বাধে বা গন্ধে তেমন কোন পার্থক্য না হলেও চা বানানোর তোড়জোড়, পরিবেশন ভঙ্গি ও মূল্যমানে বেশ চমক আছে। এছাড়া মনে মনে একটু ভেবে দেখুন সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৮০০ ফুট উপরে হিমেল সন্ধ্যায় প্রিয় মানুষটির হাত ধরে পাহাড়ী বাঁশের দুটি পেয়ালায় দুজনের উষ্ণচায়ের চুমুক কতটা মনোমুদ্ধকর হতে পারে। চায়ের উষ্ণতা আর নিকট জনের মনের উষ্ণতা দুয়ে মিলে এক অপূর্ব অনুভূতি আপনাকে ভালোলাগার পরশ বুলিতে দিতে একটুও কার্পণ্য করবে না। তাই এক কাপ বাঁশচা চল্লিশ টাকায় পকেট কাটলেও এই বাঁশচায়ের অনুভূতি আপনার মনে থাকবে। নানা পদের স্ট্রিটফুড দিয়েই রাতের ডিনার শেষ করে ফেললাম। পরবর্তী গন্তব্য 'লুসাই গ্রাম'। রাস্তার পাশেই সৃষ্টি করা হয়েছে লুসাই গ্রামের আবহ। নাম শুনে ভেবেছিলাম হয়তো প্রকৃত আদিবাসিদের গ্রাম। তাই এ ধরনের উত্তেজনা নিয়ে খোঁজা শুরু করলাম লুসাই গ্রাম। কিন্তু আবিস্কার হওয়ার পর দেখলাম এটি পর্টকদের বিনোদনের উদ্দেশ্য সৃষ্টি করা হয়েছে এক বিশেষ গ্রাম। সন্ধ্যা ঘনীভূত হওয়ায় লুসাই গ্রামের ভিতর প্রাথমিক ভাবে এক চক্কর দিয়ে ফিরে এলাম।

ক্রমে সন্ধ্যার গাঢ অন্ধকারকে বৈদ্যুতিক আলোক ছটায় পরাভূত করেছিল। আস্তে আস্তে শুক্ল পক্ষের চন্দ্রমা কখন যে পাহাড়ের অন্ধাকারকে গ্রাস করে আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছে বুঝতেই পারিনি। চাররদিকে খুববেশী মানুষের কলরব নেই। রাতের নিরবতা গ্রাস করে নিল পুরো ভ্যালি। আমরা আবাস রুনময়ে ফিরে এলাম। পাহাড়ের হাঁটা হাঁটির পর রাতে নিদ্রাদেবীকে আর আহবানের প্রয়োজন হলো না। তিনি খুব অল্প সময়েই ধরা দিলেন।

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সকাল ৫.৩০-এ ঘুম থেকে উঠে পড়ি। উদ্দেশ্য কংলাক পাহাড়। পাহাড়ে সূযোর্দয় দেখা। রাতের ঘোর এখনো কাটেনি। নেই কোন বনমোরগের ডাক বা মসজিদের আজানের ধ্বনি। পাহাড়ে সূযোর্দয় দেখার আগ্রহে আমার ভ্রমণসঙ্গীরা এত ভোরে উঠে প্রস্তুতি নিয়ে তৈরী। যারা কাজ না থাকলে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত বিনা দ্বিধায় ঘুমিয়ে থাকে। তাই একটু কষ্ট হলেও আমিও উঠে পড়লাম। কুয়াশা আর অন্ধকার ভেদ করে গাড়ির তীব্র আলো পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো গন্তব্য কংলাক পাহাড়ে। দুই কিলোমিটারের মত পাহাড়ি পথ বেয়ে পাশের পাহাড়টি কংলাক পাহাড়। আগেই বলেছি সাজেকভ্যালি মূলত বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের ২টি পাহাড়ের সমন্বয়ে গঠিত রুইলুই পাড়া ও কংলাক পাড়া। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৮০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত কংলাক পাহাড় থেকে লুসাইপাহাড় সুস্পষ্ট দৃশ্যমান হয়। রুইলুই পাহাড় থেকে কংলাক পাহাড়ের পাদদেশে শেষ হয়েছে পাকা রাস্তা। এরপর গভীর অরণ্য। নিচে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির কিছু জনবসতি আছে। মিজোরাম সীমান্তের কাছে হাঁটা পথে দুরত্ব দুঘন্টা তবে খুবই দুর্গম পথ। এই অঞ্চলে লুসাই পাহাড় থেকে সৃষ্টি হয়েছে কর্ণফুলী নদীর। এই নদীকে নিয়ে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় বাংলা এক অসাধারণ পল্লীগান। যা মলয় ঘোষ দস্তিদারের কথায় ও অজ্ঞাত সুরকারের সুরমালায় এখনো সারাদেশে গীত হয় এই অপূর্ব মোহময় গানটি।

"ছোড ছোড ঢেউ তুলি ফানি।
লুসাই পাহাড় উরতুই লামিয়ারে যার গৈ কর্ণফুলী।।
এক কুলদি শহর বন্দর নগর কত আছে
আর এক কুলত সবুজ রুয়ার মাতাত সোনালী ধান হাসে।
হালদা ফাডা গান হুনাইয়ারে সাম্পান গারে
গৈ পাল তুলি ।।
হত না গিরস্তের বৌঝি পানি আইনতো যায়,
হত ফাকি গাছের আগাত বই হত গান হুনায়।
গাছর তলাত মালহা বানুর গান গোরূপ পোয়া
গায় পরান খুলি।
লুসাই পাহাড় তুর লামিয়ারে যার গৈ কর্ণফুলী।।
পাহাড়ী কন সুন্দরী মাইয়া ঢেউঅর পানিত যাই
সিয়ান গড়ি উডি দ্যাকের হাতত খানর ফুল তার নাই,
সেইদিন খানের দুল হারাইয়ের হেইদিনতুন
নাম কর্ণফুল হোয়রে,
লুসাই পাহাড় উরতুন লামিয়ারে সাই গর জায় ছলি।।

কী অপরূপ ভাষায় প্রকাশ। প্রকৃতি, প্রেম ও ভাবনার এক অপূর্ব সমন্বয় কবি মলয় ঘোষ ফুটিয়ে তুলেছিলেন যার আবেদন আজো অম্লান হয়ে রয়েছে। চট্টগ্রামের সীমানা পেরিয়ে এ গান সারা দেশ জুড়ে গীত হয়।

আমরা গাড়িতে পাহাড়ে মধ্যবর্তী স্থানে এসে থামলাম। আবছা অন্ধাকরে পবর্ত শিখরে প্রায় ১০০ ফুট খাড়া উঠতে হবে। প্রথমে দেখে একটু ভয় লাগলেও খাড়া পথ বেয়ে উঠতে খুব বেশী কষ্ট লাগলো না। প্রীতম তো কয়েক মিনিটেই অদৃশ্য হয়ে গেল। পরে সহধর্মীনিকে নিয়ে উঠে দেখি সে অনেক আগেই উঠে পড়েছে। পাহাড়ের উপরে উঠে দেখলাম অপরিকল্পিত ঝুপড়ি ও কিছু স্থাপনা উপরিভাগের সৌন্দর্য একেবারে

ম্লান করে দিয়েছে। তৈরী হয়েছে বেশ কয়েকটি কটেজ। আছে একটি মসজিদ। রুইলুই পাহাড়ের শিখরেও সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে মোগল স্থাপত্যের নকশায় খুব সুন্দর একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। যা হয়তো শতবর্ষ পরে কালের সাক্ষী হিসেবে স্থাপত্যকলার নিদর্শন হয়ে থাকবে।

কংলাক পাহাড়ের অধিকাংশ স্থাপনাগুলো পাহাড়ের পূর্বপাশে তাই সূর্যোদয় দেখার জন্য দৃশ্যমান কোন স্থান খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। উত্তর ও দক্ষিণে দুই মাথায় দুটি স্থান ছাড়া দাঁড়ানোর তেমন কোন স্থান নেই। অপরিকল্পিত স্থাপনায় পর্যটন কেন্দ্রের বেহাল অবস্থা বেশ কষ্টদায়ক। আমরা একটু আগেই এসে পড়ায় পাহাড়ে কোন প্রাণের সাড়া নেই। আমাদের পদশব্দে কয়েকটি অবাঞ্ছিত কুকুরের ঘুম ভেঙ্গে গেল। কুয়াশার আবেশ কাটিয়ে উঠতেই কটেজে অবস্থানকারী পর্যটকগণ উঠতে শুরু করলেন। তারপর আরো কিছু পর্যটক রুইলুই পাহাড় থেকে এসে হৈ হল্লোড় শুরু করলো। কিন্তু এতো কিছুর মধ্যেও সূর্যদেবের সাক্ষাৎ মিললো না। অবশেষে সকাল ৭.০০ টার দিকে তিনি নববধুর মতো কুয়াশার আবরণ ভেদ করে এক ঝলক উঁকি দিয়ে আবার মেঘের আড়ালে বিদায় নিলেন। আমাদের ভাগ্যটিই যেন কেমন। সূর্যোদয় দেখার জন্য বাংলাদেশের কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে ভোর ৫ টায় উঠে বীচের দিকে বাইকে চড়ে প্রায় নয় কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে অপেক্ষা করেছি। কিন্তু মহারাজের দেখা মিললো এক ঘন্টা পর ৪৫০ কোণে কুয়াশার মেঘ অতিক্রম করে। একইভাবে ১৯৯৮ সালে ভারতের কন্যাকুমারীতেও সূর্যোদয়ের দৃশ্য অবলোকন করতে দল বেঁধে সাগর পাড়ে অপেক্ষা করেছি ভোর ৫ টা থেকে। কিন্তু সেখানেও একই অবস্থা। ত্রিবেনী সঙ্গমের প্রচন্ড গর্জন আর ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যেও সকাল ৮ টার আগে রবির কিরণ পৌঁছেনি। তাই সাগর বা পাহাড়ে সূর্যোদয়ের এই ব্রহ্ম মুহূর্তটি দেখার সুযোগ থেকে প্রকৃত অর্থে বঞ্চিত রইলাম।

কিন্তু খুব ছোটবেলায় আমরা আম কুড়ানো, ফুল তোলা, বরইতলায় ঝড়ে পড়া বরই খোঁটার জন্য খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতাম। বিশেষ করে পৌষ মাসে সূর্যোদয়ের অন্তত একঘন্টা আগে ঘুম থেকে উঠে হ্যাঁসড়া ঠাকুরের (লোকজ অনুষ্ঠান) পূজা করতাম। এটি ছিল শিশুদের পূজা। তখনো মা, বাবা বা বড়রা ঘুমিয়ে থাকতেন। পাড়া প্রতিবেশী সকল ভাইবোনরা একসাথে একটি তুলসীগাছের বেদীকে কেন্দ্র করে গীত আহবানে হ্যাঁসড়া ঠাকুরকে তুষ্ট করা হতো। সবশেষে হ্যাঁসড়া ঠাকুরের বন্দনা করে সবার কল্যাণ কামনা করে প্রত্যেকের তোলা এক কুলো ভর্তি বনজ ফুল হ্যাঁসড়া ঠাকুরের উদ্দেশ্যে তুলসীগাছের বেদীতে অর্পণ করা হতো। ফুলগুলো আগের দিন বিকেলে বনবাদাড়, মাঠ থেকে তোলা হতো। সবই বুনো ফুল। এগুলো ছিল প্রথাগত পূজোর ফুলের বাইরের ফুল যেমন ভূঁইচাঁপা, ভাঁটি ফুল, মন্দার বা শিমুল ফুল ইত্যাদি বুনোফুল । এভাবে পুরো একমাস ফুল দিতে দিতে শুকনো ফুলের স্তুপ তৈরী হতো। পৌষ সংক্রান্তির দিন সেই ফুল জলে বিসর্জন দিয়ে তুলসী মঞ্চকে এলোমাটি দিয়ে লেপে পরিছন্ন করে মা পূজা দিতেন। তারপর সকলে মিলে মায়ের হাতে বানানো মোয়া মুড়ি, মুড়কি খাওয়ার একটা ধুম পড়ে যেত। দীর্ঘ এক মাস সকাল-বিকেল পরিশ্রমের পর একটা মোয়া ছিল খুবই আকর্ষণীয় ও লোভনীয়। অথচ আজকের ছেলে মেয়েরা এত অল্পে তুষ্ট হয় না। কালের আবর্তনে সেই হ্যাঁসড়া পূজো আজ আর হয় না। হ্যাঁচড়া ঠাকুর কোথায় অন্তর্ধান হয়েছেন তাও আজ কেউ বলতে পারবে না। যার কাছে একমাত্র বন্দনা ছিল, “হ্যাচড়া ঠাকুর কালো আমাদের রেখ ভালো।” সেই ঠাকুর এখন কেমন আছেন জানিনা। তবে আমরা যে বেশী ভালো নেই এটা সহজেই বোঝা যায়। পৌষের এই কনকনে শীতে পুজোর অছিলায় অন্তত সকালে ঘুম থেকে উঠার বাধ্যবাধকতা ছিল। বিশেষ করে হ্যাঁসড়া ঠাকুরের ওসিলায় পৌষের শীতে শিশুদের ঘুম থেকে তোলার একটি মোক্ষম দাওয়াই হিসেবে কাজ করতো এই পুজো। আজকাল আর কোন শিশু সকালে ঘুম থেকে উঠে না। সেই আম কুড়োনো ছোটবেলা নেই বললেই চলে। শিশুরা রাত তিনটা পর্যন্ত মোবাইলে চ্যাট করে। কাজ না থাকলে দুপুর ২টা পর্যন্ত অবলীলায় ঘুমিয়ে থাকে। প্রতিদিনের সকাল তো অনেক দূরের কথা মাস বা বছরে বিশেষ কার্যোপলক্ষে সকালের সূর্যোদয় দেখার সুযোগও তাদের হয় না। এতো কথায় অবতারণা করার মূল উদ্দেশ্য হলো আমরা যখন সকালে তুলসী তলায় পুস্পাঞ্জলি দিয়ে উঠতাম এরপর তীব্র শীত আর ঘন কুয়াশার হাত থেকে একটু উষ্ণতার পরশ পাওয়ার জন্য ছুটে যেতাম বাড়ির পূব পাশে রোদ পোহানোর উঠোনে। এই উঠোনের পাশে একটি পুকুর তারপর এক কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তির্ণ মাঠ। যা কামখালির বিল নামে পরিচিত। মাঠ পাড়ি দিলে ডিস্টিক বোর্ড এর রাস্তা। রাস্তার ধারে লম্বালম্বিভাবে লক্ষ্মীপুর, মহেষপুর, ঝামা ও আড়মাঝি নামের চারটি গ্রাম। যা মধুমতি নদীর পাড় ঘেষে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। আমরা একটু উষ্ণতার খোঁজে যখন রোদ উঠানে আসতাম তখন সূর্যদেব রক্তিম আভা ছাড়িয়ে বিশাল থালা সদৃশ উদয় হতেন । মধুমতির পাড় ঘেষা সবুজ বৃক্ষরাজির মাথার উপর দিয়ে। পৌষ-মাঘ মাসে মাঠে বিছানো থাকতো সবুজ আর হলুদের আস্তরণ। দীর্ঘ এক কিলোমিটার জুড়ে সরিষা ফুলের অপরূপ মোহয়তাকে বাড়িয়ে দিতো তার গা বেয়ে উঠা মটরশুটির লতাগাছ। সকালের মিঠে রোদ অল্প সময়েই কুয়াশার তৈরী শিশির বিন্দুকে বাস্পীভূত করে সরিষা ফুলকে সতেজ আর প্রাণবন্ত করে তুলতো। ঘন কুয়াশায় এক ধরনের জাব পোকা ফুলের সৌন্দর্যকে ম্লান করে দিয়ে কৃষকের মুখে কালো আভা ছড়িয়ে দিতো। একমাত্র অতি সূর্য রশ্মি কৃষকের এই দুঃখ ঘুচিয়ে দিত। বাড়ির এই বাহির উঠোনে বসে সূর্যোদয় দেখা কিন্তু কম আকর্ষণীয় ছিল না। সেই সূর্যোদয় দেখার আনন্দ থেকে আজ আমরা বঞ্চিত। শহরের পঙ্কিল আবর্তে জড়িয়ে থাকা মানুষগুলো তাইতো সাগর আর পাহাড়ের ঘনবনে খুজেঁ ফেরে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস। একটু শান্তি আর স্বস্তির পরশ পেতে ছুটে চলার নিরন্তর প্রয়াশ।

কংলাক পাহাড় বা কমলাক পাহাড় দর্শন শেষে আবার কটেজে ফিরে আসা। কটেজের সৌন্দর্য তখনো শেষ হয়নি। পূর্ব আকাশের আলো ছায়ার আবরণ পশ্চিমাকাশে আস্তে আস্তে প্রসারিত হয়ে

সুন্দর সকালের আমেজ তৈরী করেছে। রুনময় কটেজের দোলনায় বসে বসে সেই দৃশ্য অবলোকন করতে করতে নাস্তার ডাক পড়লো। পরে রুটি, পরোটা, সব্জি ও ওমলেট যোগে অপূর্ব আহার।

পরবর্তী গন্তব্য লুসাই গ্রাম

লুসাই একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী। তারা পূর্ব বাংলাদেশ, উত্তর-পূর্ব ভারত এবং মায়নামারে বসবাস করে। তারা নিজেদের মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর বংশধর বলে পরিচয় দেয়। ১৮৪০ সাল পর্যন্ত লুসাইদের কথা জানা যায়নি যতদিন না উত্তর থেকে জেলাকে আক্রমণ করে। ১৮৪২ সালের নভেম্বরে ব্রিটিশ ভূখন্ডে তাদের প্রথম আক্রমণ সংঘটিত হয় এবং এরপর থেকে তারা ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে সবচেয়ে বিরক্তিকর উপজাতিগুলির মধ্যে একটি প্রমাণিত হয়। কিন্তু ১৮৯০ সালে অভিযানে উত্তর লুসাই গ্রামগুলি শান্তিচুক্তির ফলে শান্ত হয়। ১৮৮৯ সালে দক্ষিণ লুসাই পাহাড়ের দেশ পরিচালনা করার জন্য বঙ্গ থেকে আসামে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়।

কিংবদন্তী অনুসারে চীন দেশের রাজা চিনলুং তাঁর বাবার সাথে মতের অমিল থাকার কারণে তাঁর অনুসারিদের নিয়ে বার্মায় (মিয়ানমার) চলে আসেন এবং সেখানে গ্রাম তৈরি করে বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে উক্ত রাজার বংশধররা চিনহিলস, মনিপুর, কাছাড়, মিজোরাম, সাতিকাং (চিটাগাং) অঞ্চলে প্রায় দুইশত বছর রাজত্ব করেন। এই রাজার উত্তরসুরী যমহয়াকার রাজার রাজত্বকালে তাঁরা বঙ্গা দেশের রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ি বাংলাদেশে লুসাইদের মোট সংখ্যা ৬৬২ জন। এছাড়াও ভারতের মিজোরামে অনেক লুসাইয়ের বসবাস রয়েছে। তাদের অধিকাংশই পাহাড়ে জুম চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে।

বিলুপ্ত প্রায় এই জনগোষ্ঠির জীবনাচার ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদির সামান্য অংশ তুলে ধরে রাস্তার পাশে একটি কৃত্রিম গ্রামের আবহ সৃষ্টি করা হয়েছে। করোনার ভয় থাকলেও স্ত্রী ও পুত্রের জন্য ২০০ টাকায় দুটি পোশাক ভাড়া নিয়ে আবার গ্রামে প্রবেশ করলাম। লুসাই হেরিটেজ ট্রি হাউজ বর্ণনা আগেই দিয়েছি। গ্রামে ঢুকেই প্রথমে পড়লো এই হেরিটেজ ট্রি হাউজ। শুরু হলো ছবি তোলার মহড়া। সামনে বামে এগোলেই দোকানদার বিহিন দোকান। কেনার মতো তেমন কিছু মিললো না। দেশী বুনো কলা, বাঁশ দিয়ে বানানো চায়ের কাপ, কোমল পানীয় ইত্যাদি। এক লুসাই মহিলার সাথে আলাপ হলো বললাম দোকানদার বিহিন দোকানের পরিবর্তে সততার দোকান নাম দিলে কেমন হয়। মহিলা একটু অখুশি হয়ে বললেন কেন আমরা আপনাদের নাম দেবো আমাদের নিজস্ব নাম থাকতে। তার প্রতিবাদ বেশ ভালো লাগলো। আর কথা বাড়ালাম না।

জলবুক

এখান থেকে সামনে এগোলে পড়বে জলবুক নামক একটি স্থান বা ঘর । জলবুক এমন একটা স্থান যেটা সকল অবিবাহিত লুসাই পুরুষদের প্রথাগত আবাসিক থাকার জায়গা যা গ্রামের নিরাপত্তার স্বার্থে রাত্রিযাপনের জন্য ব্যবহৃত হত। এখান থেকে তারা আদিবাসীদের উন্নয়ন, কুস্তি, শিকার, শিক্ষা, বিনোদন, ব্যক্তিগত দক্ষতা, নিরাপত্তা শিক্ষা এবং গ্রাম সরকার ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ নিতেন। এটা একই সাথে ভ্রমণকারীদের ও গ্রাম দেখতে আসা মানুষের বিশ্রামের স্থানও ছিল। লুসাই যুবকের ১৫ বছরের বেশি হলেই জলবুকে ভর্তি হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হত। নারী ও শিশুদের জলবুকের ভিতরে প্রবেশের অনুমতি ছিল না। ৬ থেকে ১৫ বছর বয়সী বালকদের দায়িত্ব ছিল এখানের জ্বালানী কাঠ সরবরাহের যাতে করে উনুন সবসময় জ্বালানো যায়। ভাল উপা নামের একজন তরুণ কমান্ডার জলবুকের নিয়মকানুন ও দেখাশোনার জন্য দায়িত্বে থাকতেন। যিনি প্রধান ও বায়োজ্যেষ্ঠদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। ব্রিটিশ শাসন আবির্ভূত হবার পর পরই জলবুকের গুরুত্ব কমতে থাকে। প্রথাগত শিক্ষা ও খ্রিস্টীয় ধর্মে দীক্ষা দান শুরু হবার পর থেকে জলবুকের গুরুত্ব ও জৌলুশ কমতে থাকে।

জলবুক প্রকৃত পক্ষে এক চালা বিশিষ্ঠ চৌকো কাঠ, বাঁশ ও ছনের তৈরী ঘর। বড় বড় গাছ দিয়ে বেশ সুন্দর সিড়ি বানানো হয়েছে। ইচ্ছা করলে এখানে এক রাত থেকে যেতে পারেন তবে নিশ্চয় শীতের রাত আরাম দায়ক হবে না। কিন্তু গ্রীষ্মের হাওয়া আপনাকে পাগল করে দেবে একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। ভিতরে একটি প্যানাফ্লেক্স এ জলবুক সর্ম্পকে লেখা রয়েছে;

ZAWLBUK: Zawlbuk is a traditional dormitories of all lushai youths/unmarried men over 15 years. All Lushai young men should stay here at night for the protection of the village from wild animals or their enemies. It was also a place where they received training in tribal welfare wresling, hunting and village government, the training was intensive and strenuous, strict disciplines was maintained and basic values of life were inculcated on the youngsters. Ladies and children are not allowed to enter inside the Zawlbuk but boys around 6-14 years old were given duty to supply fire wood to ensure that the hearth/fire place was always alight. The Zawlbuk usually came fully to life in the evening when youngsters gathered there to exchange ideas, they sang songs of heroism and spoke of achievements of their ancestors. Late in the evening they went out to keep dates with their girlfriends and returned around bed times to have good night's sleep. The practice of Sleeping out on a regular basis with their friends and neighbors helped the Lushai youths to build up a strong awareness of community welfare. The Zawlbuk began

লুসাইদের ঐতিহ্যবাহী চের-লাম নাচ

to lose its importance after the appearance of the British on the scene. The introduction of formal education and conversion to Christianity leading to a steady decline in the utility and relevance of the Zawlbuk.

লালসুত (নিরাপত্তা স্তম্ভ)

এরপর একটু ডান দিকে এগিয়ে গেলে দেখা যাবে কাঠ ও বাঁশের পাটাতন যুক্ত আরো একটি ঘর নাম লালসুত। প্রাচীন আদি লুসাই সমাজে কোন মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত খুনী আসামী মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনের প্রতিশোধের ভয়ে গ্রাম প্রধানের বাড়িতে গিয়ে এই স্তম্ভ স্পর্শ করলে তাকে গ্রামের নিরাপত্তা প্রদান করতেন গ্রাম প্রধান। সেই আসামী ও তার পরবর্তী বংশধরেরা সেই সময় থেকে গ্রাম প্রধানের দাস হয়ে যেত।

কাওয়াছুহ লুংডো

কাওয়াছুহ লুংডো গ্রামের শুরুর একটি জায়গা যেখানে শিকারীরা তাদের শিকার করা পশুর মাথার খুলি বা শত্রুকে হত্যার পর তার মাথার খুলি এখানে ঝুলিয়ে রাখতো। কোন শিকার নিয়ে বা যুদ্ধজয়ের পর গ্রামে ফিরে শিকারীরা এখানে দাঁড়িয়ে "হারাদো" নামে এক উচ্চস্বরে গানের মাধ্যমে গ্রামবাসীকে জানাতো তারা কি শিকার করেছে। জুমচাষের জমিতে কাজ করতে যাওয়া বাবা মায়েদের সন্তানেরা তাদের বাবা মার জন্য এখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতো।

THANGCHHUAH PA

"Thangchhuahpa" was a social status given to a man who could preform "Khuangchawi" (a king of festive ceremony, feeding the whole village for four days feast by killing many different animals, compulsory animal to spear is "Sial" (Mithun), alcohol etc,. in the case of 'in lama Thangchhuah' (it needs rich man).

Or, complete a set of kill list necessary to attain the status of Thangchhuahpa in the case of 'Ram lama thangchhuah' (it indicates great hunters), the compulsory kill includes Elephant, tumpang (a king of wild bison), Bear, Zukchal (the full grown stag with it antler in its full glory, wild boar and vahluk (flying spuirrel), muvanlai (eagle), rulngan (king cobra) and sakie (tiger). It was one of the highest status person can achieve which benefitted him in mar ways. Infact, it was the goal of all men-young or old it become a Thangchhuahpa and claim their place with the social hierarchy. Being a thangchhuahpa come with various attributes:

He can enter 'Pialral' (Paradise) after death and live

on ready made foods.

A Thangchhuahpa is considered to be a great and respected figure, pleased by the chief himself and respected by all.

He can wear 'Thangchhuah Puan' (colth). Only thangchhuahpa are allowed to wear this cloth.

He can open window as wide as the wishes and can make 'Bahzar' and 'Vanlunyg' as he wish to. Commoner/ widow, generally lower Class people are not aloowed to open window in Lusai society in the ancient time.

If he could perform three times ' Khuangchawi' he is given a high status of being a ' Zau dawh thei' Which permits him to choose the best place to build his home in a village.

ধর্মবিশ্বাস

লুসাই জনগোষ্ঠী লোকবিশ্বাস তাদের কারো মৃত্যুর পর মৃতের আত্মা 'মিথিখুয়া' নামক মৃতপূরীতে বাস করে। মিথিখুয়াতে অবস্থানকালে প্রত্যেকের নিজ নিজ কর্মফলের বিচার হবে। কর্মফল অনুসারেই তারা স্বর্গ (পিয়াল রাল) যেতে পারবে। পৃথিবী ছেড়ে মিথিখুয়াতে যাবার মান হিসেবে (থি টিন থলা) আগস্ট মাসকেই ধরা হয়। তাই লুসাই সমাজে আগস্ট মাসে কোন বিয়ের অনুষ্ঠান বা বিনোদনমূলক উৎসব করা হয় না। বর্তমানেও এ রীতি মানা হয়। লুসাইরা আদিতে সৃষ্টিকর্তা বা পাথিয়েল বিশ্বাস করতো। লুসাই জনগোষ্ঠী এককালে জড়োপাসক ও সর্বপ্রাণবাদের বিশ্বাসী ছিল। তারা ভূতপ্রেত, অপদেবতা ইত্যাদি বিশ্বাস করতো। তারা ভূতপ্রেত ও অপদেবতা উদ্দেশ্যে পশু দিয়ে শিবপূজা ও নদীপূজা দিত।

অতীতে লুসাইরা যার যার গ্রামে একেক নিয়মে দেবদেবীর পূজা করতো। পরে লুসাইদের মধ্যে খ্রিস্টানধর্ম বিস্তার লাভ করে। বর্তমানে শতভাগ লুসাই খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। ধর্মীয় উৎসব পালন ছাড়াও বছরে তারা প্রধান তিনটি উৎসব পালন করে থাকে;

১. চাপচারকূত (বসন্ত উৎসব)

২. মীমতূত (মৃত আত্মাদের স্মরণে) এবং

৩. পলকূত (শস্য কাটার উৎসব)।

এছাড়াও রয়েছে চাপচার কুট, মিনকুট, পাল কুট। তাদের মাতৃভাষায় রচিত বিভিন্ন গান ও আদি নৃত্য। মনকুট উৎসব-জুমের ঘাস কাটা যখন শেষ হয় তখন এই উৎসব করা হয়। চাপচার কুট-এটি নবান্ন উৎসব। জুমের ধান কাটা শেষ হলে এই উৎসব করা হয়।

লুসাইদের খাদ্যভ্যাস ও পোশাক

লুসাইদের প্রধান খাদ্য ভাত ও শাকসবজি। তারা জুমচাষ-এর মাধ্যমে ধান, শাকসবজি ইত্যাদি উৎপাদন করে। লুসাইদের প্রিয় খাবারের মধ্যে 'সা-উম-বাই' (শূকরের তেল, শাকসবজি ও কাঁচামরিচ দিয়ে তৈরি তরকারি) অন্যতম। মাছ, মাংস দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করে রাখার উদ্দেশ্যে লুসাইরা মাচার উপর আগুনের তাপে ঝুলিয়ে রাখে এবং পরে রান্না করে খায়।

লুসাইরা অতীতে পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি পোশাক পরিধান করতো। পরবর্তীকালে তুলা থেকে উৎপন্ন সুতা দিয়ে তৈরি 'হুখাল' নামে একধরণের চাদর প্রথমে লুসাই পুরুষরা এবং পরে নারীরা ব্যবহার শুরু করে। সময়ের পরিবর্তনে মহিলারা কোমর-তাঁত দিয়ে 'পুয়ানফেল' (থামি), 'করচুং' (টপস/ব্লাউজ) প্রভৃতি এবং পুরুষরা 'করচুর' (শার্ট) ও পুয়ানবি (লুঙ্গি) তৈরি করে ব্যবহার করতে শুরু করে। এছাড়া লুসাই নারীরা বিভিন্ন ধরনের থামি যেমন পুয়ান রৌপুই, পুয়ান চেই, পুয়ানদুম, ভৌতে খের পরিধান করেন। লুসাই নারীরা বিভিন্ন ডিজাইনের অলংকার দিয়ে নিজেদের সাজাতে পছন্দ করেন। তারা দামী পাথরের মালা পরেন।

উনবিংশ শতকের শেষার্ধে দুজন আর্থিংটন ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি রেভা এফ. ডব্লিউ সেভিডজ ও রেভা জে. এইচ লরেইন এর প্রচেষ্টায় রোমান অক্ষরের অনুকরণে লুসাই বর্ণমালা তৈরি করেন। যুবকদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষাকেন্দ্র নির্মাণ করেন। আস্তে আস্তে লুসাইরা পড়াশুনায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। বর্তমানে প্রায় ৯৬% লুসাই শিক্ষিত এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছে।

লুসাই সংস্কৃতি

লুসাইরা খুবই সংস্কৃতিমনা এবং নিজেদের সংস্কৃতি রক্ষার ব্যাপারে সচেতন। নিজস্ব ঐতিহ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, অলংকার ইত্যাদির ব্যবহার এখনও প্রচলিত আছে।

বিবাহ প্রথা

লুসাইদের মধ্যে জ্যাঠাতো বা কাকাতো ভাইবোনের বিয়ে হতে পারে না। তবে মামাতো ও খালাতো ভাইবোনের মধ্যে বিয়ে হয়। বর্তমানে খিস্টধর্ম গ্রহণের পরে বিয়ের ব্যাপারে কোনো বাধা না থাকায় অতীতের রীতিনীতি অদ্যাবধি পালিত হয়। অভিভাবক বা যুবক যুবতীর নিজের পছন্দে বিয়ে হলে প্রথম 'পালাই' (মধ্যস্থতাকারী) হিসেবে ছেলেপক্ষের কেউ মেয়েপক্ষের নিকট প্রস্তাব পাঠাবে। মেয়ের পিতামাতা ও নানা নানী রাজি হলে আলোচনার মাধ্যমে বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করা হয়।

লুসাই সমাজে বিয়েতে পণপ্রথা বিদ্যমান। অতীতের রীতিনীতি অনুসারেই কনে বিয়ের ২/১ দিন আগেই পিতামাতা আত্মীয়স্বজনসহ প্রথমে পালাই-এর বাড়িতে এসে অবস্থান গ্রহণ করে। পালাই শুকর কেটে তাদের ভোজের ব্যবস্থা করে। বিয়ের দিন বরপক্ষ পালাই-এর বাড়ি থেকে কনেকে নিয়ে এসে প্রথমে বরের বাড়িতে এবং পরে গীর্জায় গমন করে। গীর্জায় তাদের বিবাহকার্য সম্পন্ন হওয়ার পরে বরের বাড়িতে সকল আত্মীয়স্বজন যায় এবং সেখানে ভোজের আয়োজন করা হয়। ঐদিন কনে বরের বাড়িতেই অবস্থান করে। ২/১ দিন পরে কনে পালাই-এর বাড়িতে যায় এবং তার সমস্ত জিনিসপত্রসহ বরের বাড়িতে ফিরে আসে। লুসাই সমাজের প্রথা অনুযায়ী আগস্ট মাসে বিবাহ অনুষ্ঠান করা

হয় না। অতীতে লুসাই বিবাহ অনুষ্ঠানে বর জামা ও লুঙ্গি এবং কনে ব্লাউজ ও থামি পরলেও বর্তমানে বর শার্ট-প্যান্ট এবং কনে সাদা গাউন পরিধান করে। লুসাইদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ও বিধবা বিবাহ বিদ্যমান।

খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের পর থেকে মৃতদেহ সৎকারে লুসাইদের নানা আচার এবং মৃত আত্মাদের নিয়ে বিভিন্ন বিশ্বাস এখন আর নেই। খ্রিস্টান ধর্মানুযায়ী প্রার্থনার পর মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়। যুবকরা কবর প্রস্তুত করে এবং একটি পাথরে মৃত ব্যক্তির নাম, মৃত্যুর তারিখ এবং তার গ্রাম ইত্যাদি লিখে কবরের উপর মাটিতে পুঁতে রাখে।

যাহোক লুসাই গ্রাম ঘুরতে ঘুরতে সকালের সূর্যদেব প্রচন্ড তেজ বিকিরণ করতে করতে মধ্য গগন অতিক্রম করছেন। আর এতো হাঁটাহাঁটির পর আমাদের মধ্যপ্রদেশও বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলো। তাই ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য খোঁজাখুঁজি শুরু হলো। এ বিষয়ে আমাদের কনিষ্ঠতম সদস্যের মতই প্রণিধানযোগ্য। তার ইচ্ছা বাম্বু বিরিয়ানি। তার রসনা বিলাসের প্রশংসা করতেই হয়। দোপেয়ে চার পেয়ে না হলে তার কোন বেলাতে আহারে রুচি হয় না। তাই বাধ্য হয়ে বাম্বুবিরিয়ানির দোকান খুঁজতে শুরু করলাম। খাবার যার যার রুচির উপরে ছেড়ে দিলাম। তবে ছেলের জন্য বাম্বু বিরিয়ানি নির্ধারিত। অদ্ভুত রান্নার কৌশল একটি আস্ত কাঁচাবাঁশের ফাঁফা একটি চোঙ্গা দেড় ফুট লম্বা তার মধ্যে চাল, মাংস, তেল ও মসলা প্রয়োজনীয় জলসহ ঢেলে দিয়ে কলাপাতা দিয়ে মুখটা বন্ধ করে কয়লার আগুনে বসিয়ে দিলেই কিছুক্ষণ পর সুস্বাদু বিরিয়ানি খাওয়ার জন্য প্রস্তুত। এক বাম্বু বিরিয়ানি নগদ ৭০০ টাকা। ভালো খানেদার এক জনের জন্য একটাই যথেষ্ট। তবে আমাদের শ্রীমানের জন্য পুরোটা খাওয়া কিছুটা কষ্টকর বিধায় আমরাও তার থেকেই একটু ভাগ বসালাম। বেশ চমৎকার স্বাদ কেউ ভয়ে বঞ্চিত হবেন না।

দুপুরের খাবার শেষ করে আবার হোটেলে ফেরা। সাজকের ছোট ভ্যালি দেখা মোটামুটি শেষ। এখন অবসরের পালা। আমার মোবাইলে কোন নেটওয়ার্ক নাই। তাই নিশ্চিন্তে থাকার একটা মজা অনুভব করলাম। যদিও ছেলে কিভাবে যেন সংযুক্ত হয়ে তার ব্যবসা চালিয়ে গেল। এ দুদিনে রুণময়ে খাওয়া হয়নি। ম্যানেজার বেশ সজ্জন মানুষ বললেন স্যার আজ রাতে আমাদের এখানে খাওয়া দাওয়া করেন। বললাম বেশ ব্যবস্থা নিন। এরপর হোটেলের দোলনায় বসে বিকেলটা কাটিয়ে দিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো সামনের বন থেকে ঝিঁ ঝিঁ পোকার আওয়াজে মুখরিত হয়ে উঠলো চারদিক। আমি অলসদেহে আস্তে আস্তে ঘরে প্রবেশ করলাম।

কিছুক্ষণ পর হোটেল বয় এসে রাতের খাবার প্রস্তুত বলে জানালেন। আমরা প্রস্তুতি নিয়ে বেরিয়ে এলাম ডাইনিং টেবিল প্রস্তুত। রাতের মেনু খুব বেশি কিছু নয়। বাম্বু চিকেন সঙ্গে সবজি পরোটা ও রুটি। কি চমৎকার খাবার সকলে মিলে একসঙ্গে আমরা রাতের আহার শেষ করলাম। সত্যি অপূর্ব স্বাদ। এই অঞ্চলে বাম্বু বিরিয়ানি, বাম্বু চিকেন, বাম্বু চা সবাই মজা করে উপভোগ করেন। আমরা বঞ্চিত হব কেন? সকলে মিলে মনোমুগ্ধকর অত্যন্ত উপভোগ্য রাতের খাবার শেষ করে আবার একটু বাইরে বেরিয়ে জোসনা রাতে ঘুরতে বের হলাম। তারপর সকলে মিলে হোটেলের রুমে ফিরে আসি। আগামীকাল বিদায় নিতে হবে রাঙামাটির উদ্দেশ্যে।

১৯৯২ সালে একবার খাগড়াছড়ি এসেছিলাম বিএমএ কোর্সের প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে তখন এ অঞ্চলে উপজাতিদের সঙ্গে বিরোধ চরম পর্যায়ে। প্রতিদিন যুদ্ধ মৃত্যুর খবর এবং নানান ধরনের বাঙালি ও উপজাতিদের মধ্যে সংঘর্ষ লেগেই থাকত। আমাদেরকে দিঘীনালা উপজেলায় প্রোগ্রাম থাকলেও তার আগেরদিন পাঁচজন বাঙালি শান্তিবাহিনীর সদস্য কর্তৃক নিহত হয়। তাই দীঘিনালা প্রোগ্রাম বাতিল করে আমাদেরকে মহালছড়ি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মহালছড়ি উপজেলা চমৎকার পাহাড়ে ঘেরা হলেও এ উপজেলায় রয়েছে বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি রয়েছে। সেই সময়ের কাহিনী এখন আর মনেও নাই। তবুও জীবনে পাহাড় ভ্রমণের প্রথম আনন্দ উপভোগ করেছিলাম। আমরা খাগড়াছড়ির পথে সকাল আটটার দিকে রওনা হলাম। দ্রুত গতিতে ধাবমান দ্রুতযান পাহাড়ের চড়াই-উতরাই পেরিয়ে দুই ঘন্টার মধ্যেই খাগড়াছড়ি এসে উপস্থিত হলো। খাগড়াছড়িতে পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক একটি বিশাল ইকো-পার্ক তৈরি করা হয়েছে একবার দেখার জন্য প্রথমেই আমরা হাজির হলাম ইকো-পার্কের গেটে। সেখানে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা নেজারত ডেপুটি কালেক্টর এবং আমাদের অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তাগণ আগে থেকেই অবস্থান করছিলেন। তারা ইকো-পার্ক-এ আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। ইকো-পার্কের সামনে সুদৃশ্য পাহাড়ি মানুষদের তৈরি বিভিন্ন ধরনের পোশাক ও অন্যান্য কারুকার্য খচিত গৃহ সরঞ্জামাদির পসার জমিয়ে বসেছে। এই ধরনের অপূর্ব কারুকার্যখচিত কিছু পোশাক সকলের জন্য টুকটাক কিনে নিলাম। এরপর ইকো-পার্কের ভিতরে ঢুকে বেশ ভালো লাগলো। বিশাল এলাকা নিয়ে গঠিত হয়েছে খাগড়াছড়ি ইকো-পার্ক। সাধারণ মানুষের বিনোদনের জন্য একটি অপূর্ব পর্যটন কেন্দ্র। আপনি যদি খাগড়াছড়ি হয়ে সাজেকভ্যালি যেতে চান তাহলে অবশ্যই খাগড়াছড়ি ইকোপার্ক এবং অন্যান্য যে সমস্ত দৃশ্যমান পর্যটন কেন্দ্রগুলো রয়েছে তা দেখার চেষ্টা করবেন। অন্যথায় আপনার এই পার্বত্য জেলা ভ্রমণ অপূর্ণ থেকে যাবে। আমরা সপরিবারে ইকো-পার্ক ভ্রমণ শেষে পরবর্তী গন্তব্য ফুলকলির সমাধিস্থলে রওনা হলাম।

খাগড়াছড়িতে পর্যটকদের কাছে অন্যতম দর্শনীয় স্থানের নাম জেলা প্রশাসকের ‘হাতি ফুলকলি’র সমাধি। জেলা শহরের প্রবেশমুখে স্থাপিত নান্দনিক স্থাপত্যশৈলী ও ফুলকলির ইতিহাস জানতে প্রতিদিন শত শত পর্যটক ফুলকলির সমাধিতে ভিড় জমাচ্ছে। স্থানীয়দের পাশাপাশি বাইরের পর্যটকদের কাছেও দিন দিন এর আকর্ষণ বাড়ছে।

খাগড়াছড়ি যখন মহকুমা ছিলো তখন দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় রাস্তা-ঘাট না থাকায় মহকুমা প্রশাসকের পরিবহণপুলে সরকারিভাবে হাতি লালন পালন করা হতো। সর্বশেষ হাতিটির নাম ছিলো ফুলকলি যা ১৯৯০ সালের ২৭ জুলাই মৃত্যুবরণ করে। হাতির পিঠে চড়ে প্রশাসনিক কাজ সম্পাদন করার যে ঐতিহ্য মহকুমা/জেলা প্রশাসকগণের ছিল সেটি

জেলায় আগত অসংখ্য পর্যটকের সামনে তুলে ধরার জন্য জেলা প্রশাসকের হাতি ফুলকলির সমাধিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছে। ফুলকলির সমাধি খাগড়াছড়ি জেলার এক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত একটি পর্যটন স্থান। যে স্থানটি হাতির কবর নামে পরিচিত। বর্তমান জেলা প্রশাসক প্রতাপ চন্দ্র দে হাতির কবরটিকে নান্দনিক রূপ দিয়ে একে পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত করেছেন। একজন রুচিশীল মানুষের হাতে কোন জিনিসই পড়লেই সে যে নান্দনিক রূপে তাকে সাজিয়ে তুলতে পারে এটাই তার প্রমাণ।

আমাদের পরবর্তী গন্তব্য রাঙামাটি জেলা। সকাল ১১ টার দিকে খাগড়াছড়ি পার্ক দর্শন শেষে আমরা মহাল ছড়ি হয়ে রওনা হই। মহালছড়ি একটু সমতল এলাকা বেশ ভালো ফসল হয়। আগেই বলেছি ১৯৯২ সালে বিএমএ ট্রেনিং এর সময় মাঠ পর্যায়ে ভিজিটের জন্য আমরা মহালছড়িতে এসেছিলাম এবং এই মহালছড়ি ক্যাম্পে আমরা দু'রাত অবস্থান করি। যার জন্য রাস্তা এবং পাহাড়ের দৃশ্য কিছুটা পরিচিত মনে হচ্ছিল। যেতে যেতে প্রায় এক ঘন্টার রাস্তা অতিক্রম করে আমরা পৌছে গেলাম রাঙামাটির সার্কিট হাউজের সামনে। রাঙ্গামাটি সার্কিট হাউজ অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এ পর্যন্ত আমার দেখা বাংলাদেশ সার্কিট হাউজের মধ্যে রাঙামাটি সার্কিট হাউজটি আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে। জেলা প্রশাসক এবং জেলা প্রশাসনকে ধন্যবাদ কারণ তারা সার্কিট হাউজটি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। আমরা সার্কিট হাউসে উপস্থিত কর্মকর্তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রাথমিক আলোচনা শেষ করি। পরবর্তীতে দুপুরের মধ্যাহ্নভোজ শেষে রাঙামাটি কাপ্তাই লেক পরিদর্শনের জন্য বের হয়ে যাই।

তথ্যসূত্র:
ক) নিজস্ব ভ্রমণ অভিজ্ঞতা।
খ) জনৈক খন্দকার ফাতেমা জোহরার একটি অনলাইন প্রবন্ধ থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ।
গ) ইন্টারনেট থেকে কিছু তথ্যের সংযোজন।

ছবি: ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করা।

ড. তরুণ কান্তি শিকদার: নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর।

পর্যটন শিল্পে সমবায়

ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস

ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণ একটি বাস্তবতা। এটি কোন স্বপ্ন নয় বরং দৃশ্যমান অগ্রগতি। এ বাস্তবতাকে সকলের অংশীদারিত্বে, সকলের জন্য উপভোগ্য করতে প্রয়োজন সহমত ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে একতাবদ্ধ হয়ে উন্নয়ন কার্যক্রমে সামিল হওয়া।

১৯৭২ সালের ৩০ জুন, বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, "বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, ধ্যান ধারণা ও আরাধনার ধন। আর সে সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচে-কানাচে, উপেক্ষীত কন্দরে কন্দরে, বিস্তীর্ণ জলাভূমির আশেপাশে আর সুবিশাল অরণ্যের গভীরে। ভাইয়েরা আমার, আসুন সমবায়ের জাদুর স্পর্শে গ্রাম বাংলাদেশকে জাগিয়ে তুলি। নবসৃষ্টির উন্মাদনায় জীবনের জয়গানে তাকে মুখরিত করি।" জাতির পিতা সেদিন সমবায়ের অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে সুপ্ত গ্রাম বাংলাকে জাগিয়ে তোলার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫০তম জাতীয় সমবায় দিবস (২৬ নভেম্বর ২০২১) উপলক্ষে প্রদত্ত বাণীতে দেশের সকল সমবায়ীদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ সমবায়ের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তা বাস্তবায়নে সমবায় সংগঠন গুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

সমবায় একটি সম্মিলিত উদ্যোগ, একটি সংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠী, একটি ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা, "একতাই বল" যার মূল মন্ত্র এবং "ঐক্য ই শক্তি" যার মূল নীতি; সদস্যদের স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সামাজিক অঙ্গীকার, পারস্পরিক সহযোগিতা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন যার কর্মকৌশল। সারাদেশ জুড়ে রয়েছে হাজারো সমবায় সমিতি এবং লক্ষ লক্ষ নিবেদিত প্রাণ কর্মী ও সংগঠক। সমবায়ের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় সমকালীন প্রযুক্তি ও সেবা বিষয়ক ব্যবস্থাপনা এবং দক্ষতা উন্নয়মূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানবসম্পদ রূপে গড়ে তোলা সম্ভব। বাংলাদেশের মত জনবহুল একটি দেশে বেকার ও ছদ্মবেশী বেকার যুবকদের দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তর ও কর্মে নিয়োগ এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও জীবনমানের উন্নয়নের মাধ্যমে সরকার ঘোষিত ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে কার্যকর ও ফলপ্রসূ অবদানের অবারিত সুযোগ রয়েছে সমবায়ের।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পরে দীর্ঘ ৫০ বছরে দেশের অর্থনীতিতে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। এক সময়ের কৃষি নির্ভর অর্থনীতি ধীরে ধীরে শিল্প ও সেবা খাতে সম্প্রসারিত হচ্ছে। গত এক দশকে ৬.৩ শতাংশ হারে বার্ষিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে, যা সপ্তম দ্রুত উন্নয়নশীল অর্থনীতি; জিডিপির কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে উন্নীত হয়েছে ৩৫তম অর্থনীতির দেশে। ২০১১ সাল হতে ২০২১ সাল পর্যন্ত অর্থনীতির প্রধান তিনটি (কৃষি, শিল্প ও সেবা) খাতের জিডিপিতে অবদান কার্যালোচনায় দেখা যায়, কৃষি খাতের অবদান ধীরে ধীরে কমে আসছে বৃদ্ধি পেয়েছে শিল্প ও সেবা খাত। ২০১৭ সালে সেবা খাতের অবদান ছিল ৫১.৩৮ শতাংশ যা এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ। তবে করোনা মহামারীর কারণে পর্যটনসহ সেবা খাত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শিল্পে ব্যাপক ধ্বস নামে। ফলশ্রুতিতে জিডিপি তে সেবা খাতের অবদান কমতে থাকে এবং ২০১৯ সালে ৫০.৮৫ শতাংশ এসে দাড়ায়। পরবর্তীতে, করোনা মহামারীর প্রাদুর্ভাব কমে আসলে পর্যটনসহ সংশ্লিষ্ট সেবাখাত সমুহের কার্যক্রম পুনরায় শুরু হলে এ খাতের অবদান

ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে এবং ২০২১ সালে ৫১.৩০ শতাংশে উন্নীত হয়। জিডিপির খাতভিত্তিক অবদান পর্যালোচনায় স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান, ভবিষ্যতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সেবা খাতের অবদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে। দীর্ঘ দশ বছর যাবৎ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিক বৃদ্ধি সত্ত্বেও মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্যের উদ্ধোগতি, আয় বৈষম্য, সম্পদের সুষম বণ্টনের অভাব ইত্যাদি নানাবিধ কারণে দেশের বহু মানুষ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল থেকে বঞ্চিত। বিশেষত গ্রামীণ জীবনে এ অবস্থা আরো প্রকট। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামোর মূল বুনিয়াদ গ্রাম, দেশের ৬১.০৫ ভাগ মানুষ গ্রামে বসবাস করেন এবং কৃষি খাতে নিয়োজিত শ্রমিকের ৪০.৬ শতাংশের যোগানদাতা এই গ্রামীণ জনপদ। ঐতিহ্যগত ভাবে বাংলাদেশের কৃষি শ্রমিকেরা খন্ডকালীন শ্রমিক, সারা বছর তাঁদের কাজের একই রকম সুযোগ থাকে না। অঞ্চল ভেদে বছরের কোন না কোন সময়ে কৃষি শ্রমিকেরা কর্মহীন এবং আয়-রোজগার বিহীন অবস্থায় আর্থিক দুরবস্থার শিকার হয়ে পড়েন এবং তখন সরকারের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচির সুবিধা গ্রহণ করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। অথচ ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে এ সকল ছদ্মবেশী বেকার কৃষি শ্রমিকদের বিকল্প কোন কর্মে নিয়োজিত করা সম্ভব হলে তাদের জীবনের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব হবে এবং দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় ব্যয়িত অর্থ সাশ্রয় হবে, যে অর্থ ব্যবহার করে অন্য কোনো উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

পর্যটন শব্দটি সর্বপ্রথম ১৮১৮ সালে বিনোদনের সাথে সম্পর্কযুক্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। UNWTO এর মতে, কোন ব্যক্তি অবসর, ব্যবসা অথবা অন্য কোন কারণে নিজ আবাসস্থলের বাহিরে এক বছরের কম সময় ভ্রমণ বা অবস্থান করলে তা পর্যটন হিসেবে গণ্য হয়। (Tourism comprises the activities of persons travelling to and staying in places outside there usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purpose.) পর্যটন পণ্য বলতে একসঙ্গে কতগুলো উপাদান দ্বারা গঠিত "ব্যান্ডেল" কে বুঝায় যা ভোক্তার চাহিদা পূরণ করে। সাধারণভাবে পর্যটন পণ্য বলতে বিভিন্ন পর্যটন আকর্ষণ এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় সেবাকে বুঝায়। যে কোন শারীরিক, বস্তু, সেবা, ব্যক্তিত্ব, স্থান, প্রতিষ্ঠান এবং কোন ধারণা এর অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। প্রাচীনকাল থেকেই এদেশে পর্যটকদের আগমন ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। অফুরন্ত পর্যটক সম্ভাবনার দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। বিশ্বের যে কোনো পর্যটককে আকৃষ্ট করার মত সকল উপাদান রয়েছে এদেশে। বাংলাদেশের গৌরবময় ইতিহাস, সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, বন্ধু বৎসল মানুষ ও তাদের অকৃত্রিম আতিথেয়তা, নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি, দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত, বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট, বন-বনানী, জীববৈচিত্র্য, নদীমাতৃক বাংলার চির সবুজ জনপদ এবং বৈচিত্র্যময় আদিবাসী সংস্কৃতি যে কোন পর্যটকের নিকট অত্যন্ত আকর্ষণীয়। বর্তমানে বিশ্ব অর্থনীতির ক্রম বর্ধমান খাত সমূহের অন্যতম সেবাখাত। সেবা খাতে সর্ববৃহৎ অংশীদার পর্যটন শিল্প। পৃথিবীব্যাপী সকল দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে এ শিল্প। বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ এবং পর্যটন একটি শ্রমঘন শিল্প। আগ্রহী বেকার ও শিক্ষিত যুব সমাজকে পর্যটন বিষয়ক প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে শ্রমঘন পর্যটন শিল্পে নিযুক্তির মাধ্যমে ব্যাপক সংখ্যক জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থানসহ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। প্রয়োজন পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা।

বেকার সমস্যা বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যা দিনে দিনে প্রকটতর থেকে প্রকট রূপ ধারণ করছে। নারী, পুরুষ, শিক্ষিত, স্বল্প-শিক্ষিত, অশিক্ষিত নির্বিশেষে কাজ না পেয়ে কর্মক্ষম যুব সমাজ হতাশায় ভুগছে। অনেক ক্ষেত্রে বিপথগামী হচ্ছে, পারিবারিক ও সমাজ জীবনে সৃষ্টি হচ্ছে দুর্বিসহ যন্ত্রণা। বেকারত্ব সহনীয় পর্যায়ে ধরে রাখা সম্ভব না হলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা জিডিপির আকার বৃদ্ধি সমাজিক স্থিতিশীলতা সৃষ্টিতে সহয়াক হবে না। লক্ষ লক্ষ কর্মক্ষম মানুষকে কর্মহীন রেখে দারিদ্র্যমুক্ত দেশ ও স্থিতিশীল সমাজ গঠন করা সম্ভব নয়। এ বাস্তবতার নিরিখে বেকার সমস্যা দূরীকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি সরকারের অগ্রাধিকারভুক্ত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্মসূচি। বিজ্ঞান ভিত্তিক কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, শিল্পে আইটি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স

ও তথ্য প্রযুক্তি প্রচলনের ফলে পূর্বের তুলনায় স্বল্প সংখ্যক মানুষ দিয়ে বর্তমানে তুলমামূলক অনেক বেশি কাজ করা সম্ভব। সে তুলনায় সেবা খাত মানুষের কাজের জন্য এখনো অনেকটাই উন্মুক্ত, প্রয়োজন কেবল দক্ষতা অর্জন। একজন পর্যটক বাড়ির বাইরে বের হওয়ার পর থেকে ঘরে ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণ করেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজের প্রকৃতি ভিন্ন হওয়ায় সেবা সরবরাহকারী পৃথক ব্যক্তি হবেন এটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পর্যটন আকর্ষণ কেন্দ্রে রয়েছে, সংগত কারণে স্থান ও পর্যটন পন্যের প্রকৃতি বিবেচনায় দক্ষতা চাহিদাও ভিন্নতর। দেশের ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে জনগোষ্ঠীর একটি অংশের আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দেশের পর্যটন আকর্ষণ এলাকায় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির বিপণনের বিষয়টি ব্যাপক প্রচারণার ফলে মানুষের মাঝে ভ্রমণ প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় বর্তমানে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে দেশীয় পর্যটকের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও বিভিন্ন কারণে বিদেশি পর্যটকের আগমন আশানুরূপ নয়। তবে ইতোমধ্যে সে সকল বিষয় বিবেচনায় নিয়ে পর্যটন মহা-পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলছে। আশা করা যায়, নিকট ভবিষ্যতে বাংলাদেশের পর্যটন বর্তমান সময়ের তুলনায় বর্ধিত কলেবরে বিকাশ লাভ করবে। পর্যটন উন্নয়নের এ সন্ধিক্ষণে প্রয়োজন পর্যটন বান্ধব সমবায় ভাবনা অর্থাৎ পর্যটন শিল্পের সাথে সমবায়ের সংযোগ ও সম্পৃক্ততা। সমবায়ীদের

পর্যটন শিল্প বা পর্যটন বাণিজ্যে অন্যতম সফল অংশীজন হিসেবে আত্মপ্রকাশের এখনই সময়। দেশব্যাপী সমবায় সমিতির অসংখ্য সদস্য রয়েছেন যারা পর্যটন শিল্পে সেবা দিতে সক্ষম ও আগ্রহী। কিন্তু যথাযথ কর্মক্ষেত্র চিহ্নিত না হওয়া, সেবাদান পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা না থাকা এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাবে, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সমবায়ীদের সেবা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে পর্যটক, পাশাপাশি সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও পর্যটন সেবায় আত্মকর্মসংস্থান ও জীবনমান উন্নয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সমবায়ী। আশার কথা, অগ্রবর্তী সমবায়ী সংগঠকদের আগ্রহে ইতোমধ্যে কয়েকটি জেলায় 'পর্যটন শিল্প সমবায় সমিতি' গঠন করা হয়েছে। সমিতির সদস্যবৃন্দ কিভাবে পর্যটন শিল্পে অবদান রাখবে তার জন্য প্রয়োজন কর্মক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ। সমবায়ীদের উন্নয়নের জন্য যেমন রয়েছে সমবয় অধিদপ্তর, তেমনি দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্য জাতীয় পর্যটন সংস্থা হিসেবে রয়েছে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড। দুটি প্রতিষ্ঠানই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দু'টি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ থেকে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। এ দুটি দপ্তরের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে পর্যটন শিল্পে সমবায়ীদের কর্মক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ, সক্ষমতা যাচাই, কর্মে নিযুক্তি লাভের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও কর্মক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা সম্ভব হলে, সমবায়ের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও সংগঠিত শক্তি পর্যটন শিল্পে বিভিন্ন ধরনের সেবায় সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হবে এবং সমবায় বিভাগ পর্যটন শিল্পের উল্লেখযোগ্য অংশীজন হিসেবে পরিগণিত হবে। সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক এই আশাবাদী উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হলে, বেকার সমস্যার সমাধান, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সমবায়ীদের জীবন মান উন্নয়নের মাধ্যমে সরকার ঘোষিত, ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে কার্যকর অবদান রাখতে সক্ষম হবে সমবায়।

ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস : অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

সমবায় অধিদপ্তরে অমর একুশে আলোচনা, প্রকাশনা উৎসব ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

গত ২০ ফেব্রুয়ারি, সোমবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে আগারগাঁওস্থ সমবায় অধিদপ্তরে অমর একুশে আলোচনা, প্রকাশনা উৎসব ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিচারপতি ওবায়দুল হাসান, আপিল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন, বিপিএম (বার), পিপিএম, পুলিশ মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, জনাব সত্যজিত কর্মকার, সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, জনাব মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মশিউর রহমান, এনডিসি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সভায় বক্তাগণ মহান একুশের শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে অমর একুশের তাৎপর্য তুলে ধরেন।

জনাব মোঃ হুমায়ূন খালিদ, সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ড. কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ড. অসীম সরকার, অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জনাব সুরজিৎ রায় মজুমদার, সহযোগী অধ্যাপক (বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা), ইংরেজি বিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা

অধিদপ্তর অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ড. তরুণ কান্তি শিকদার, নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর এর গবেষণা গ্রন্থ Crime and Punishment in Ancient India গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। গ্রন্থটিতে

প্রাচীন আমলে শাস্তির ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণ ও উচ্চবর্ণের বিভেদ লক্ষ করা যায়। ব্রাহ্মণকে কোনো প্রকার শারীরিক দন্ড বা বধ দন্ড রহিত করা ছিল। একমাত্র কোনো ব্রাহ্মণ অনৈতিক নারী সংসর্গে লিপ্ত হলে তাকে কপালে গরম লোহার নারী যোনি চিহ্নের ক্ষত চিত্র এঁকে দেওয়া হতো এবং দেশ থেকে বহিষ্কার করা হতো। সরকারি কর্মচারীদের তহবিল তছরুপে কঠিনতম শাস্তির বিধান ছিল। প্রাচীনকালে অমাত্য (মন্ত্রী), বিচারক এবং কর্মাধ্যক্ষ নিয়োগে অনেক ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হতো। পরবর্তী তিনটি অধ্যায়ে বিখ্যাত তিন জন স্মৃতিকার কৌটিল্য, মনু ও যাজ্ঞবল্কের স্মৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মনু বলেছেন, "দুর্লভহি শুচির্নর- অর্থাৎ মানুষ জন্মগতভাবেই দুষ্ট প্রকৃতির।

মনু স্মৃতিতে, একজন মানুষকে

উপর্যুপরি তিনদিন না খেয়ে থাকলে পরবর্তী বেলার খাবারের জন্য চুরি করার অনুমতি দিয়েছে।"

জুয়া ও মাদককে সব সময় নিষেধ করা হয়েছে এবং কঠিন শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।

সর্বশেষ অধ্যায়ে Crime & Punishment এর ধারণাগুলোকে তুলনামূলক আলোচনা করে প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রশাসনিক ও শক্তিশালী একটি বিচার ব্যবস্থার রূপকল্প তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে।

আলোচকগণ মনে করেন প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে যারা আগ্রহী তাদের জন্য রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবে বইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

এছাড়াও সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্থ ও প্রতিবেদন প্রদর্শিত হয়। সবশেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভাষা শহিদ ও আন্তর্জতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে সমবায় অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অতিথিগণ উপস্থিত ছিলেন।

‘অমর একুশে বইমেলা-২০২৩’-এ সমবায় অধিদপ্তরের অংশগ্রহণ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল একটি সুখী-সমৃদ্ধ-স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তোলা। সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে ‘সমবায়’ একটি অন্যতম কার্যকর পদ্ধতি। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন সমবায় অধিদপ্তর দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে। অধিকন্তু সমবায় অধিদপ্তর সমবায় সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রকাশনা নিয়মিত প্রকাশ করে আসছে। সেই সাথে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম ও সমবায়ীদের উৎপাদনমুখী কর্মকান্ড বিষয়ক ব্রুশিয়র, সমবায়কেন্দ্রিক বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত, দেশের কৃতি ব্যক্তি ও সমবায় কর্মকর্তাগণের সমবায় সম্পর্কিত সৃজনশীল বিভিন্ন বই-পুস্তকও রয়েছে। সমবায় নিয়ে এ সকল প্রকাশনা ও কার্যক্রম জনসাধারণকে অবহিত করার উদ্দেশ্য বাংলা একাডেমি আয়োজিত ‘অমর একুশে বইমেলা-২০২৩’ এ সমবায় অধিদপ্তর অংশগ্রহণ করেছে (স্টল নং ৮৬৯ ও ৮৭০)। বাঙালি জাতিসত্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের প্রতীক বাংলা একাডেমির অমর একুশে বইমেলায় সমবায় অধিদপ্তরের বুকস্টলে নীতিপ্রণেতা, উন্নয়নকর্মী, সমবায়ীবৃন্দ, গবেষক, ছাত্রছাত্রী ও আগ্রহীদের সমবায় সম্পর্কে জানার অপরিমেয় সুযোগ রয়েছে।

সমবায়ের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অর্থবহ সমর্থন ও উৎসাহ জানাতে মন্ত্রী, সচিব, সংসদ সদস্য, সরকারি উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, কবি-সাহিত্যিকগণসহ অসংখ্য দর্শনার্থী সমবায় অধিদপ্তরের বুকস্টল পরিদর্শন করেন।

সমবায় অধিদপ্তরে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৩ উদযাপন

সমবায় অধিদপ্তরে ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৩ উদযাপন করা হয়। গণহত্যা দিবস -২০২৩ উপলক্ষ্যে ২৫ মার্চ রাত ১০.৩০ – ১০.৩১ মি. ব্ল্যাক আউট - বৈদ্যুতিক বাতির সুইচ বন্ধ রাখা হয়। ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। সকালে সমবায় অধিদপ্তরের সমবায় ভবনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। ১০.৩০ টায় সমবায় অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং দেশের উন্নয়ন শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব তরুণ কান্তি শিকদার আলোচনা সভায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সমবায় অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের কর্মসূচি যথাযথভাবে পালন করা হয়।

সমবায় অধিদপ্তরের ঐতিহাসিক ৭ মার্চ পালন

ঐতিহাসিক ০৭ মার্চ দিবস উপলক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচাল ও কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

ঐতিহাসিক ০৭ মার্চ দিবস উপলক্ষ্যে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতি সমবায় অধিদপ্তরের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মবার্ষিকী ও শিশু দিবস ২০২৩ পালন

১৭ মার্চ ২০২৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মবার্ষিকী ও শিশু দিবস ২০২৩ উপলক্ষে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব ও কর্মকর্তাগণের এর শ্রদ্ধাঞ্জলি

১৭ মার্চ ২০২৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মবার্ষিকী ও শিশু দিবস ২০২৩ উপলক্ষে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. তরুণ কান্তি শিকদার। এ সময় তিনি মঞ্চে উপবিষ্ঠ একজন 'বীর মুক্তিযোদ্ধ ' সমবায় অধিদপ্তরের সাবেক অতিরিক্ত নিবন্ধক জনাব মোঃ সাইদুজ্জামানকে শিশুদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন।

১৭ মার্চ ২০২৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মবার্ষিকী ও শিশু দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি সাবেক সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম

চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা পরিদর্শন করছেন প্রধান অতিথি সাবেক সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এবং নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড.তরুণ কান্তি শিকদার

১৭ মার্চ ২০২৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মবার্ষিকী ও শিশু দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানে এক শিশুকে পুরস্কার দিচ্ছেন নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড.তরুণ কান্তি শিকদার

১৭ মার্চ ২০২৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মবার্ষিকী ও শিশু দিবস ২০২৩ অনুষ্ঠানে কেক কাটছেন প্রধান অতিথি সাবেক সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এবং নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড.তরুণ কান্তি শিকদার

স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট সমবায়

হরিদাস ঠাকুর

১. বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক সমবায় দর্শন এবং স্মার্ট বাংলাদেশের নিয়ামক

৩০ জুন ১৯৭২ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত বাণীতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায় সম্পর্কে তাঁর ঐতিহাসিক দর্শন বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ-সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। ...বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, ধ্যান, ধারণা ও আরাধনার ধন। আর সে সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচকানাচে, চির উপেক্ষিত পল্লীর কন্দরে কন্দরে, বিস্তীর্ণ জলাভূমির আশেপাশে আর সুবিশাল অরণ্যের গভীরে। ভাইয়েরা আমার-আসুন সমবায়ের জাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রাম বাংলাকে জাগিয়ে তুলি। নব-সৃষ্টির উন্মাদনায় আর জীবনের জয়গানে তাকে মুখরিত করি'।

জাতির পিতার সমবায় দর্শনের এ ঐতিহাসিক বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করলে বাংলাদেশের জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নের কয়েকটি প্রত্যয় খুঁজে পাওয়া যায়। এগুলো হলো :

১. দেশের প্রতিটি মানুষের মৌলিক চাহিদার পরিপূরণ;
২. বাংলাদেশের জনগণের জীবনমান হবে উন্নত;
৩. গণমুখী সমবায় আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন নিয়ামক হবে;
৪. সমবায় হবে বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের সোনার বাংলার উৎসারক;
৫. সমবায়ের জাদুস্পর্শে জাগরিত হবে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের জনগণ;
৬. সুপ্ত গ্রাম বাংলার জাগরণেই বাংলার জনগণের জীবন মুখরিত হবে;
৭. নব-সৃষ্টির উন্মাদনায় উদ্বেলিত হবে বাংলাদেশ।

উপরোক্ত ৭টি উন্নয়ন নিয়ামক ডিজিটাল বাংলাদেশ তথা স্মার্ট বাংলাদেশের বিনির্মাণ সূচকের সাথে সম্পর্কিত এবং জাতির পিতার দূরদর্শী উন্নয়ন ভাবনারই প্রতিফলন।

২. বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনায় সমবায়

বঙ্গবন্ধু উন্নয়নকে দেখেছিলেন একটা অখণ্ড বিষয় হিসেবে। তাঁর কাছে উন্নয়ন মানে কেবল সম্পদ অর্জন কিংবা মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি নয়। তিনি উন্নয়ন বলতে বুঝতেন সার্বিকভাবে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অগ্রগতি, সামাজিক প্রগতি, শিক্ষার ব্যবস্থা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার উদ্বোধন, নেতৃত্বের বিকাশ, আত্মরক্ষার ক্ষমতা, দুর্নীতিমুক্ত সংস্কৃতি, শোষণহীন বিকাশ, জাতীয় ঐক্য এসবের সম্মিলিত অগ্রসর অবস্থা। আজকাল যেসব বিষয়কে উন্নয়নের সামাজিক সূচক বা সোস্যাল ইন্ডিকেটর বলা হয়, বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনে সেসব তখনই অন্তর্ভুক্ত ছিল। নিরঙ্কুশ পুঁজিবাদ ব্যক্তির প্রকট মুনাফাবাজীকে অনুমোদন দেয়, উৎসাহিত করে, প্রণোদিত করে; অবধারিতভাবেই শোষিত-বঞ্চিত হয় শ্রমিক ও ভোক্তা নিম্নশ্রেণির মানুষ। অন্যদিকে নিরঙ্কুশ সমাজতন্ত্র ব্যক্তির প্রতিভার বিকাশ, সৃজনশীলতার চর্চা ও স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকারকে হরণ করে রাখে। নিরঙ্কুশ পুঁজিবাদ কিংবা নিরঙ্কুশ সমাজতন্ত্র কোনো ব্যবস্থাই নির্ভেজাল আদর্শ জীবনপ্রণালি নয়। বঙ্গবন্ধু এই দুয়ের মাঝামাঝি একটা মিশ্র প্রকৃতির আর্থসামাজিক

ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসন চেয়েছিলেন, তার রূপরেখা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর এমন অনন্য উন্নয়ন দর্শনের সহযোগী পদ্ধতি ছিল সমবায়। বঙ্গবন্ধু তাই সমবায়কে উন্নয়নের প্রধানতম পন্থা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। পুনশ্চ উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু সনাতন সমবায় পদ্ধতির মধ্যেও কিছু প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন যাতে করে তা শোষিতের অর্থনীতি ও সাধারণ মানুষের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় অধিকতর সহায়ক হতে পারে। তিনি সুস্পষ্টভাবে ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, 'কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে ন্যায্যমূল্য, শ্রমিকরা পাবে শ্রমের ফল-ভোগের ন্যায্য অধিকার। কিন্তু এই লক্ষ্যে যদি আমাদের পৌঁছাতে হয়, তবে অতীতের ঘুণে ধরা সমবায় ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করে একটি সত্যিকারের গণমুখী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। অতীতের সমবায় ছিল শোষক গোষ্ঠীর ক্রীড়নক। তাই সেখানে ছিল কোটারী স্বার্থের ব্যাপক ভূমিকা। আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশে ঐ ধরনের ভুয়া সমবায় কোনোমতে সহ্য করা হবে না। আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন, কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। আপনারা জানেন, সমবায় সংস্থাগুলোকে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমি ঘোষণা করেছি যে সংস্থার পরিচালনা-দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর, কোনো আমলা বা মনোনীত ব্যক্তির উপর নয়।'

৩. গন্তব্য সোনার বাংলা- কর্মযজ্ঞ Smart Bangladesh

জাতির পিতার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর প্রজ্ঞাময় নেতৃত্বের মাধ্যমে 'অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ'কে উন্নয়নের মহাসড়কে নিয়ে যাচ্ছেন। ঘোষিত হয়েছে 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ'-এর রূপরেখা। এ উন্নয়ন রূপরেখায় সরকারের অঙ্গীকার হিসেবে ২১০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার পরিকল্পনা সোপান করা হয়েছে। এসব পরিকল্পনা প্রণয়নে এসডিজির কর্মদর্শন বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। ২১০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ এভাবে উপস্থাপন করা যায় :

বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত 'সোনার বাংলা' হিসেবে গড়ার প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার 'অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ'কে উন্নয়নের মহাসড়কে নিয়ে যাচ্ছেন। ঘোষিত হয়েছে 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ'-এর রূপরেখা। এ উন্নয়ন রূপরেখায় সরকাররে অঙ্গীকার হিসেবে আগামী ২১০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার পরকিল্পনা গতিপথ এভাবে পাওয়া যায়:

বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রার মাইলফলক

১. ২০২১ সাল : ডিজিটাল বাংলাদেশ ও মধ্যম আয়ের দেশ।
২. ২০৩০ সাল : এসডিজির জাংশন অতিক্রম।
৩. ২০৪১ সাল : উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশে।
৪. ২০৭১ সাল : সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে বিশ্বের বুকে অনুকরণীয় অবস্থানে গমন।
৫. ২১০০ সাল : ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নরে মাধ্যমে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণতকরণ।

২১০০ পর্যন্ত বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রার গতিপথ

৪. শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ থেকে নিরাপদ ব-দ্বীপ

২০৪১ সালের মধ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ে তোলার জন্য জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি সম্প্রসারণ করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের সরকার। জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বাস্তবায়নে বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪টি মাইলস্টোন দিয়েছেন। প্রথমত, ২০২১ সালের রূপকল্প -ডিজিটাল বাংলাদেশ, দ্বিতীয়ত: ২০৩০ সালে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, তৃতীয়ত: ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ বা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা এবং চতুর্থত ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ সালের জন্য।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান, কারিগরি ও প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশের যে ভিত্তি তৈরি করে গেছেন, সে পথ ধরেই ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ করে বাংলাদেশকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। এর পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে স্মার্ট বাংলাদেশ দর্শন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনউন্নয়নবান্ধব এক উন্নয়ন দর্শন।

স্মার্ট বাংলাদেশ আসলে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও উদ্ভাবনী জাতি গঠনেরই রূপকল্প। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাস্তবায়িত উদ্যোগগুলোর সম্প্রসারণ এবং নতুন নতুন উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই এই লক্ষ্য অর্জন করতে চায় সরকার। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের তিনটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনকে সামনে রাখা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে- (ক) জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলা, (খ) উদ্ভাবনী জাতি গঠন এবং (গ) অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল সমাজ বিনির্মাণ।

এসব লক্ষ্য অর্জিত হলে ২০৪১ সালে দেশ হবে প্রযুক্তিনির্ভর মেধাভিত্তিক স্মার্ট বাংলাদেশ।

শেখ হাসিনার উন্নয়ন দর্শনের আলোকে স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি মৌল উপাদান পাওয়া যায়। এগুলো হলো-

ক. স্মার্ট জনগণ
খ. স্মার্ট সমাজ
গ. স্মার্ট অর্থনীতি
ঘ. স্মার্ট সরকার

স্মার্ট বাংলাদেশের সফল বাস্তবায়ন আমাদের নিয়ে যাবে নিরাপদ বাংলাদেশ নামক কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়র দর্শনের বীজ সেখানেই নিহিত রয়েছে।

৫. Smart Bangladesh কর্মযজ্ঞে সমবায়ের অংশগ্রহণ

বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে Smart Bangladesh-এর উন্নয়নের মহাসড়কে অগ্রসরমান বাংলাদেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সমবায় অধিদপ্তরকে সামগ্রিক পরিকল্পনা ও কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নে নবতর চেতনায় এগিয়ে যেতে হবে। এই এগিয়ে যাওয়াটা সময়, চাহিদা ও প্রয়োজনের নিরিখে আবশ্যক। এ পরিপ্রেক্ষিতে সমবায় ভাবনাকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে সমবায় অধিদপ্তরকে তিনটি কর্মপ্রত্যয়কে সামনে রেখে অগ্রসর হতে হবে :

১. সমবায়কে শুধুমাত্র তাত্ত্বিক আদর্শভিত্তিক সনাতনী সংগঠন না করে সৃজনশীল ও উৎপাদনমুখী উদ্যোগ আত্মস্থ করে নিজেরাই যাতে নিজেদের এলাকায় সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের একটি মজবুত সংগঠনে পরিণত হতে পারে তার ব্যবস্থা করা।
২. বাংলাদেশের সমবায় স্থানীয় ও জাতীয়ভাবে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির আশীর্বাদ গ্রহণ ও ব্যবহার করে যাতে বাংলাদেশের জনগণের সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের মজবুত সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমবায়ের সক্ষমতা ও আর্থসামাজিক দ্যোতনা প্রমাণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।
৩. চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সাথে তাল মেলাতে সমবায়কে যুগোপযোগী কর্মযজ্ঞে সম্পৃক্ত করা।

Smart Bangladesh-এর কর্মযজ্ঞে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন আমাদের পাথেয় এবং বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমবায় অঙ্গীকার আমাদের প্রেরণা। স্মার্ট বাংলাদেশ কর্মযজ্ঞে সমবায় সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত আমরা খুঁজে বের করে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। Smart Bangladesh-কর্মযজ্ঞে সমবায় অধিদপ্তরে পরিকল্পনা ও করণীয় এভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে:

১. সমবায় সেক্টরে উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা ও পণ্য পৌঁছানো।
২. সমবায়ীদেরকে নতুন নতুন প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ দিয়ে বিশেষায়িত পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে দক্ষ করে গড়ে তোলা।
৩. 'আন্তঃসমবায় সহযোগিতা'র সমবায় মূলনীতির বাস্তবায়ন করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সমবায়ীদের অনলাইন প্লাটফর্মে এনে উৎপাতি পণ্য ও সেবার লিংকেজ গড়ে তোলা।
৪. নতুন নতুন ক্ষেত্রে (যেমন: গার্মেন্টস সেক্টর, প্রবাসীদের কর্মসংস্থানের জন্য পতিত জমিতে কৃষি উৎপাদন, স্কুল কো-অপারেটিভ, ট্যুরিজম কো-অপারেটিভ হেলথ কো-অপারেটিভ ইত্যাদি) সমবায়কে নতুন আঙ্গিকে সম্প্রসারণ করে এর প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ঘটানো।
৫. সমবায় অধিদপ্তরের জনবলকে যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত করে Smart Bangladesh-এর উপযোগী করে গড়ে তোলা।

৬. 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণে সমবায় অংশগ্রহণ

১৯৭৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়তে হলে দেশবাসীকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে হবে। কিন্তু একটি কথা ভুলে গেলে চলবে না-চরিত্রের পরিবর্তন না হলে এই অভাগা দেশের ভাগ্য ফেরানো যাবে কি না সন্দেহ। স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও আত্মপ্রবঞ্চনার উর্ধ্বে থেকে আমাদের সকলকে আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি করতে হবে।'

সমবায় অধিদপ্তর বর্তমানে বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত এই 'আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি'র মোহনায় দাঁড়িয়ে আছে। সামনে আছে জাতির পিতার সমবায় দর্শন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমবায় অঙ্গীকার। মাননীয় প্রধনমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫ নভেম্বর, ২০১৮ খ্রি. তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৬ ও ২০১৭ বিতরণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বলেছেন:

সরকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সমবায় সম্ভাবনাময় শক্তি। সমবায়ের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে সমবায় সহায়ক শক্তি হতে পারে। দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সমবায় একটি পরীক্ষিত কৌশল।

সমবায় আন্দোলনকে জাতির পিতার সমবায় দর্শন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমবায় অঙ্গীকারকে পাথেয় করে বাংলাদেশের জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নের একটি শক্তিশালী পরীক্ষিত হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে সমবায়কে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করে আমাদের কথা-কাজ ও অঙ্গীকারের মাধ্যমে তা প্রমাণ করতে হবে : সমবায় সমিতি হচ্ছে সদস্যদের জন্য, সদস্যদের দ্বারা এবং সদস্যদের কল্যাণে পরিচালিত সংগঠন।

Smart Bangladesh-হচ্ছে কর্মমুখর প্রযুক্তিনির্ভর জনগণের উন্নত বাংলাদেশ। স্মার্ট বাংলাদেশের অবস্থান সাধারণ জনগণের কর্মচাঞ্চল্যে আর সমবায় সে কর্মচাঞ্চল্যের একটি পরীক্ষিত মাধ্যম। জাতির পিতার সমবায় দর্শন ও বাংলাদেশের উন্নয়ন সারাংশও এখানেই নিহিত রয়েছে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

হরিদাস ঠাকুর : উপসচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।

জলবায়ু পরিবর্তনে বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমনে কার্যক্রম গ্রহণ সমবায় উদ্যোগের নতুন চ্যালেঞ্জ

সমবায় ব্যবস্থায় আর্থসামাজিক উন্নয়নে সফলতা ও চ্যালেঞ্জ

কিউ আর ইসলাম

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমবায় সংগঠনগুলোর ধারাবাহিক সফলতা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কৃষির পাশাপাশি নতুন নতুন খাতে সমবায় ব্যবস্থার বিস্তার ঘটেছে। সমবায় সমিতি আইন যুগোপযোগীকরণে সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম প্রসারে সহায়ক হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সমবায় উদ্যোগের গুরুত্ব বেড়েছে। সচ্ছল ও স্থিতিশীল জীবনযাপনে সাধারণ মানুষের সমবায় ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহ, উৎসাহ এবং এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সমবায় অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্যের ভিত্তিতে কৃষি, ক্ষুদ্র ব্যবসা, পরিবহন, পর্যটন, কুটির শিল্প, আবাসন, মৎস্য, দুগ্ধ, সঞ্চয়-ঋণদান, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন, পানি ব্যবস্থাপনা, তাঁত শিল্প সহ পঁয়ত্রিশ খাতে সমবায় ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়েছে।

উৎপাদন ও কল্যাণমুখী সেবা প্রদানে সমবায় নির্ভরশীল ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের অর্থনীতিতে সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে সমবায় ব্যবস্থা বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে সংগতি রেখে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণে সমবায় সংগঠনগুলো যোগ্য হয়ে উঠেছে। সমবায় সংগঠন স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব, তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে সমবায় ব্যবস্থা প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে শুরু করেছে। কৃষি সমবায় সমিতি গ্রামীণ অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। কৃষকদের সংগঠিত করে সম্প্রসারণ সেবা গ্রহণ, উপকরণ সংগ্রহ, ঋণ সহায়তা, খামার যান্ত্রিকীকরণ, সেচ পানি সরবরাহ ও বিপণনে অবদান রেখেছে। সমবায়ভিত্তিক কৃষিযন্ত্র ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থাপনা উৎপাদন খরচ কমাতে এবং সমবায় বিপণন কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ ও আয়বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচপানি, সার ও অন্যান্য কৃষি উপকরণের সর্বোত্তম ব্যবহারে কৃষকেরা বেশ সামর্থ্যবান হয়ে উঠেছে। সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সদস্যদের সঞ্চয় আমানত নিয়ে স্থানীয় মূলধন গঠন করে সহজ শর্তে সময়মতো ঋণপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদানে সফল হয়েছে। এতে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির সাথে অন্যান্য সুবিধা প্রদান সম্ভব হয়েছে। সঞ্চয় আমানত ও ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা আর্থসামাজিক পরিবর্তনে সমবায় উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রামে কর্মজীবীদের অনেকেরই উপার্জন সীমিত। ব্যাংক থেকে আর্থিক সেবা গ্রহণের সুযোগ পায় না। সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতি এই সমস্ত কর্মজীবীদের আর্থিক সেবা দিয়ে তাদের আয় বৃদ্ধির সুযোগ করে দিয়েছে। এই সমিতিগুলো স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেবহাল থাকে। ফলে কৃষক, উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী সহ বিভিন্ন স্বল্প উপার্জনকারীদের ঋণ প্রদানে ঝুঁকির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। এইভাবে সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতিগুলো স্থানীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়ে উঠেছে। সমিতি থেকে ঋণ বাবদ নেয়া অর্থ স্থানীয়ভাবে ব্যবসা উন্নয়নে ও সামাজিক কল্যাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। মৎস্য সমবায় জেলে সম্প্রদায়কে সংগঠিত করে জীবিকার উন্নয়ন ভূমিকা রেখেছে। দুগ্ধ সমবায় কৃষি পরিবারে আয়বর্ধন ও জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে। স্থানীয় জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন হিসেবে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি পানি সম্পদের যথাযথ ও পরিবেশ অনুকূল ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। সমিতিগুলোর কার্যক্রম পানি সম্পদ অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, উপকারভোগীদের দক্ষতা উন্নয়ন, কৃষি, মৎস্য ও বৃক্ষ সম্পদ উন্নয়ন এবং গ্রামীণ পরিবারের কর্মসংস্থানের সুযোগ ও উপার্জন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হয়েছে। এইভাবে প্রতিটি সমবায় সমিতি স্ব-স্ব ক্ষেত্রে কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রেখে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। সদস্যদের সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে পেশা ও কমিউনিটিভিত্তিক সেবা ও

আর্থসামাজিক উন্নয়নের যৌথ লক্ষ্যে গঠিত সমবায় সংগঠনগুলোকে আত্মনির্ভরশীল বেসরকারি সমিতি হিসেবে গণ্য করা হয়। সমিতিতে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ, সদস্যপদ গ্রহণ এবং সাধারণ স্বার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্টতা বিভিন্ন ধরণের অংশীজনদের মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক দায়িত্ববোধ তৈরি করে। বিভিন্ন উপায়ে আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানে সমবায় সমিতি উদ্যোগী হয়। যেমন কমিউনিটি সেন্টার স্থাপন, দারিদ্র্য বিমোচন, শিশু শিক্ষা কার্যক্রম, নারী শিক্ষাবিস্তার, যৌতুক প্রথা রোধ, রাস্তাঘাট সংস্কার, মজাপুকুর পরিষ্কার, বৃক্ষ রোপণ, বনায়ন, হাসপাতাল স্থাপন, অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস, ইত্যাদি। সমবায় সংগঠনগুলোর সফলতা অব্যাহত রাখতে নতুন নতুন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

সমবায় সমিতি যেন কোনো ক্রমে সদস্য সংখ্যা, শেয়ার মূলধন, সঞ্চয় আমানত, সংরক্ষিত তহবিল ও নিট লাভ বৃদ্ধির সাথে সমৃদ্ধশালী হয়ে আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য থেকে সরে এসে বিনিয়োগকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের মতো পরিচালিত না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকার প্রয়োজন হবে। সমিতির সব সময় লক্ষ্য থাকবে স্থানীয় কমিউনিটি বা সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সুবিধা প্রদানে কার্যক্রম গ্রহণ যা থেকে সকল সুবিধাবঞ্চিতরা সদস্যভুক্ত হয়ে উপকৃত হতে পারে। সদস্যরা তাদের সামাজিক ও আর্থিক সমস্যা সমাধান ও লাভবান হওয়ার প্রত্যাশা করে। সমবায় কার্যক্রম কৃষিকেন্দ্রিক থেকে বাজার অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়নে প্রসারিত হয়েছে। ফলে সামাজিক চাহিদা ও সুযোগের প্রেক্ষিতে সমবায় কার্যক্রমে শিক্ষা, নারী ও যুবকদের সমস্যা, বেকারত্ব দূরীকরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি ও যোগাযোগ উন্নয়ন গুরুত্ব পেয়েছে। উন্নয়নমুখী কর্মকাণ্ডে সমবায় সমিতির ভূমিকা প্রসারে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি, উদ্যোক্তা সৃষ্টি, উদ্ভাবন, আর্থিক সুবিধার সুযোগ বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠা ও প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা সার্বিক দারিদ্র্য বিমোচন সহজ হবে। এই সমস্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও প্রতিশ্রুতি পালন সমবায় সমিতির সামনে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সামাজিক ও গোষ্ঠিগত বাধ্যবাধকতা মেনে গণতান্ত্রিক অনুশীলনে সমবায় সমিতি পরিচালনায় চ্যালেঞ্জর সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। সমবায় কার্যক্রমে অংশীজনদের ভূমিকা সমন্বয়ের সাথে সদস্যদের সহ বিভিন্ন পেশা ও কমউিনিটির মানুষদের একত্রিত করাও কঠিন হয়ে পড়তে পারে। উল্লেখ্য, আর্থসামাজিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবেশ সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তনে উদ্ভূত সমস্যা সম্পর্কে সবার মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মূল দায়িত্ব পালনের সাথে সমবায় সমিতিকে স্থানীয়ভাবে যথোপযোগী কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং উপ-আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এ সমস্ত সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেবে। এই দায়িত্ব পালনে সমিতিগুলোর নিয়মিত দক্ষতা উন্নয়নেরও প্রয়োজন হবে। দক্ষতা উন্নয়নে এবং টেকসই হতে সমবায় সমিতিকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদানে পদক্ষেপ নিয়ে প্রায়োগিক বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমবায় অধিদপ্তরের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সমবায়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য সামাজিক ও ব্যবসায়িক সংগঠনের তুলনায় টেকসই উন্নয়নে সমবায়ের অবদান অধিকতর কার্যকর। কারণ টেকসই উন্নয়নে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত দিকগুলো আন্তঃসম্পর্কিত এবং একে অপরের পরিপূরক। প্রকৃতিগতভাবে সমবায় তিনটি প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। অর্থনৈতিক সংগঠন হিসেবে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে, সামাজিক সংগঠন হিসেবে সাধারণ লক্ষ্য পূরণ, যথাযথ সামাজিক আচরণ, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে এবং গণতান্ত্রিকভিত্তিতে পরিচালিত সংগঠন হিসেবে কমিউনিটি ও সমাজে গঠনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে। সমবায়ের এই তিনটি ভূমিকা সহজাতভাবে একে অপরের সাথে সংশ্লিষ্ট। টেকসই উন্নয়ন অবদান রাখতে সমবায়ের সক্ষমতা কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। প্রথমত, সমবায় নীতি ও আইনেরভিত্তিতে এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত ও অর্থনৈতিক ভাবে টিকে থাকতে সক্ষমতা অর্জন। দ্বিতীয়ত, প্রতি সদস্য সক্রিয়ভাবে যেন অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সমিতির আকার আর্থিকভাবে লাভজনক বা ব্রেক-ইভেন-পয়েন্ট পর্যন্ত পৌঁছাবার জন্য যথেষ্ট হতে হবে। তৃতীয়ত, সমিতির ব্যবস্থাপনা দায়িত্ব প্রাপ্ত নির্বাচিত লিডার বা নেতাদের সমিতি পরিচালনায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, জ্ঞান লাভ ও যথাযথ পরামর্শ গ্রহণ ও সহায়তা নেয়ার পর্যাপ্ত সুযোগ থাকতে হবে। চতুর্থত, ইন্টারনেট, মোবাইল অ্যাপস, ওয়েবপোর্টাল, ফেসবুক পেইজ ইত্যাদি সহ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে সমবায় সমিতির সদস্যদের দক্ষতা অর্জন। সর্বশেষে পরিবর্তিত বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমবায় সমিতি কর্তৃক নতুন নতুন কার্যক্রম গ্রহণ। যেমন কৃষি উৎপাদনে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার, সোলার বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহার, অর্গানিক ফার্মিং, শস্য প্রক্রিয়াজাত, চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন ও সরবরাহ, রফতানি, ক্ষুদ্র বিমা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।

বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশে কল্যাণমুখী সেবা প্রদানে সমবায় সফলতার সাথে বিকল্প মডেলে পরিণত হয়েছে। সমবায় ব্যবস্থায় গ্রামাঞ্চলে যৌথ লক্ষ্য নিয়ে সেবা প্রদান কার্যকর হচ্ছে। গ্রামবাসীদের বৃহত্তর অংশ নিয়ে গঠিত সমবায় সংগঠন সামাজিক ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে সক্ষমতা অর্জন করছে। সমবায় সংগঠন নাগরিক সংহতিতে সহায়তা করছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবা প্রদান এবং সুবিধাবঞ্চিত শ্রমিকদের অন-দি-জব প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। ডে-কেয়ার সেন্টার ও প্রাথমিক বিদ্যালয় সমবায় ব্যবস্থা চালিত হতে দেখা গেছে। সমবায় ব্যবস্থায় দোকান পরিচালিত হয়ে থাকে। সমবায় ব্যবস্থায় ব্যবসার সফল প্রসারে যৌথ সেবা প্রদানে স্থানীয় কমিউনিটিকে সংগঠিত হতে সহায়তা করেছে। স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কাঠামোসমূহে সম্মিলিত উদ্যোগ সদস্যদের সর্বোত্তম ও কার্যকর সেবা প্রদান এবং সমবায় আন্দোলনকে অধিকতর শক্তিশালীকরণে সহায়ক হতে পারে।

আমাদের দেশে সমবায় সমিতির ভূমিকার উপর সিস্টেম্যাটিক বা পদ্ধতিগত গবেষণার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সমবায় ব্যবস্থার কার্যকারিতা, সমিতি গঠন, অর্থায়ন, চাহিদা, কার্যকারিতা, মূল কার্যালি, প্রতিবন্ধকতা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক তথ্য, উপাত্ত ও বাস্তব পর্যবেক্ষণ সমবায় সমিতির দক্ষতা উন্নয়নে সহায়ক হতে পারে।

সমবায়ের মাধ্যমে গণমানুষের উন্নয়নে আমাদের দায়-দায়িত্ব

অজয় কুমার সাহা

মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে সমবায় এক অপরিহার্য বিষয়। অধিকার আদায়, শোষণ, বঞ্চনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, নৈতিক অবক্ষয় ও আর্থসামাজিক মুক্তির জন্য সমবায়। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এবং একটি মহান আদর্শ। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও একে অপরের পরিপূরক হতে প্রেরণা জোগায় সমবায়। যেখানেই সমস্যা সেখানেই সমবায় আলোকবর্তিকারূপে হতে পারে। সমবায়ের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই আদর্শের চর্চা যখন সঠিক ও আন্তরিক হয় তখনই অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি সাধিত হয়।

সমবায় সমিতিগুলোর সাম্প্রতিক প্রবণতা

একটি সমবায় সমিতি গঠন ও নিবন্ধিত হবার পর তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমবায়ীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে, এটাই মূল কথা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় সমবায়ীদেরকে ব্যবহার করে কতিপয় প্রভাবশালী সদস্য নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি প্রয়াস চালান। কোনো ব্যক্তিকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার পর সদস্য হবার শর্ত পূরণ করুক বা না করুক ঋণ ব্যবসা পরিচালনা করার মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হতে সচেষ্ট হন। একপর্যায়ে এই সমবায় সমিতিকে সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত একটি সংগঠন হিসেবে পরিচয় দিয়ে তাদের কার্যক্রমকে বৈধ হিসেবে চালায়। তাদের সাথে আলাপচারিতায় এই সমবায় সংগঠনকে শুধু 'সমিতি' কিংবা 'এনজিও' হিসেবে উপস্থাপন করেন। এতে আমরা অনেকেই বিভ্রান্ত হই। সমবায় কি না জিজ্ঞেস করলে তারা সমবায়কে গুরুত্বের সাথে উচ্চারণ করেন না। এক পর্যায়ে তাদের অর্থ বিত্ত জেলায় বিশাল রূপ ধারণ করে। সমবায় বিভাগ থেকে নিবন্ধন নেবার ফলে তাদের কার্যক্রম নিয়ে খুব একটা প্রশ্ন ওঠে না। এখানে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতভাবে বিপুল পরিমান অর্থ বিনিয়োগ করে দাদন ব্যবসা পরিচালনা করে। আরো লক্ষ করা যায় সদস্য মানেই ঋণ নিতে হবে, না নিলে সদস্য থেকে বাদ দেয়ার নীতি অবলম্বন করা হয়। আসলে, সমবায়ের এইভাবে পথচলা আমরা দেখতে চাই না।

বর্তমানে অধিকাংশ সমবায় সমিতি অনিয়মের মধ্য দিয়ে চলাটাকেই নিয়ম হিসেবে উপস্থাপন করে। তাদের দাপটে সমবায় বিধিবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হতে চাওয়া সমবায় সমিতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাটাই দায়। অবৈধভাবে পরিচালিত সমিতির জৌলুসের কাছে ভালো সমিতিগুলো বড় অসহায়। গঠিত একটি সমবায় সমিতি যদি সমবায়ীদের জীবন মানের উন্নয়ন ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক না হয়ে শুধু ঋণ দেয়া-নেয়ার মাধ্যমে শোষণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে তবে কি সমবায়ের চরিত্র বজায় থাকে? এধরনের সমিতির কর্তা ব্যক্তিদের বা নানাধরনের পদ পদবিধারীদের আচরণ - বিচরণ-কথাবার্তায় আমরা অনেকেই লজ্জিত হয়ে পড়ি। এখানে ব্যক্তিস্বার্থে, অহংকারী ও আর্থিক প্রতিপত্তির বয়ান চলে।

আমরা আগে একজন সমবায়ীকে সমবায়ী হয়ে উঠার এবং সমবায়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে পরিবার পরিচালনা ও সমাজে সমবায়ের পরিচয়ে নিজেদেরকে সম্মানিত করতে উৎসাহিত করতাম। এখানে আর তা বলা যায় না। সভা সমাবেশ বা কোনো ফোরামে এ বিষয়ে মত প্রকাশে এসব নীতি বাক্যের কোনো মূল্য নেই বলে উল্লেখ করা হয়। সমবায় সমিতিতে জড়িত কর্তা ব্যক্তিদের কর্মকাণ্ডে বর্তমানে খুব অসহায় মনে হয়। সমবায়ের সুমহান আদর্শের কথা এবং সে অনুযায়ী পরিচালিত হবার অভিমত যারা উপস্থাপন করেন তারা সমিতিতে আমন্ত্রণ পান না। যারা আমন্ত্রণ পান, তাদের প্রশাসনিক ক্ষমতার কারণেই পান। সভা-অনুষ্ঠানে বা পরিদর্শনে তাদের নির্দেশনা নঃমস্য হলেও পরবর্তীতে এর কোনো গুরুত্ব নেই।

প্রকৃতপক্ষে এরকম সমবায় সমিতি তো প্রত্যাশিত নয়। তাহলে এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কী? সমবায়ীদের মনে আস্থার পরিবেশ সৃষ্টিতে করণীয় কী? তাদের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে সমবায় বিভাগের ভূমিকা কী?

দেশের দরিদ্র-আশাহত-সুবিধাবঞ্চিত মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে সংগঠিত করে বা সংগঠিত জনগোষ্ঠীকে সমবায়ের সুমহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে সমবায় সমিতি গঠণ ও নিবন্ধনের

মাধ্যমে বৈধভাবে এগিয়ে যাবার রসদ জুগিয়ে থাকে সমবায় বিভাগ। সরকারিভাবেই সমবায় বিভাগের উপর এই দায়িত্বে অর্পন করা আছে। সমবায় বিভাগ মূলতঃ সেবাধর্মী একটি প্রতিষ্ঠান। সমবায়ীরা সেবা পেয়ে উপকৃত হলেই সমবায় বিভাগের সার্থকতা।

এতে সরকারের ভাবমুর্তি উজ্জল হয়। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সমবায়ীগণ প্রকৃতপক্ষে তাদের জীবনমানের উন্নয়নে নিজেদের ইচ্ছাতে সমবায়কে উপজীব্য করেছে কিনা যেটা দেখতে হবে। সমবায় বিভাগ এবং সমবায়ীদের ভাবনা সমার্থক হলে সামগ্রিক পরিকল্পনা ও পথচলা সার্থক হয়।

বাস্তবচিত্র আমাদেরকে কী ধারণা দেয়? বর্তমানে সমবায় সমিতির সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৯৬ হাজার এবং সদস্য সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ১৮ লক্ষ। তে কী প্রমাণিত হয়? দলে দলে মানুষ সমবায়ের মহিমায় সমবায় সমিতিতে সম্পৃক্ত হচ্ছে, নাকি সমবায় বিভাগ মানুষকে সুফল দেবার প্রচেষ্টায় সফল হয়েছে?

সমবায় বিভাগের মূল কাজ

বিভাগের কাজ প্রধানতঃ তিনটি ধারায় বিভক্ত-

১. দেশের বিভিন্ন শ্রেণি পেশার উন্নয়ন প্রত্যাশী মানুষকে একত্রিত করে কিংবা একত্রিত মানুষগুলোকে সমবায়ের আদর্শ উদ্বুদ্ধ করে অধিকার সচেতন ও মৌলিক চাহিদা পূরণে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করা।

২. সমবায় সমিতি ও সমবায়ীদের কার্যাদি ঠিকঠাক চলতে পারে সেজন্য প্রয়োজন হয় প্রশিক্ষণের। এখানে সমবায় নেতৃবৃন্দ ও সদস্যদের সমবায় নীতিমালা ও আদর্শ বাস্তবায়ন, আইন-বিধি-উপআইনের বিধিবিধান যথাযথভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নে দক্ষ কারিগর হিসেবে প্রস্তুত করা।

৩. আইনগত সহায়তা ও তদারকির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি, বিবাদ নিষ্পত্তি, হিসাব সংরক্ষণ ও প্রস্তুতকরণে সহায়তা, অডিটকরণ, প্রকল্পভিত্তিক পরিকল্পনার মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা, সভা-অনুষ্ঠান- সামাজিকতা, প্রচার প্রকাশনা প্রভৃতিতে অর্থবহ সহায়তা দান।

আমরা কী করতে পারি?

বিষয়টা খুব সহজ- আমি একজন সমবায়ী অথবা সমবায় বিভাগে কর্মরত, এখানে আমার/আমাদের কাজ কী? যে যার অবস্থান থেকে প্রশ্ন করা এবং উত্তর খোঁজার আন্তরিক চেষ্টা করা হলে করণীয় সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে। অন্যেরা কে কী করলো সেটা জানার চাইতে আমার কাজ কী এবং কীভাবে করছি সেটা জানাটা গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের পথচলা সঠিক আছে কিনা এবং কোনো অসংগতি থাকলে তা সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হলে সমবায় পিছিয়ে থাকবে না। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে কর্মপরিকল্পনা কতটুকু সমবায় বান্ধব মনোভাবে সাজিয়েছেন সেটাই আসল কথা। আমরা যদি আমাদের কাজ ও দায়দায়িত্বটাকে ইতিবাচকভাবে নির্ধারণ করি তবে সাফল্য আসবেই।

সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে সমবায়ীদের অবস্থান থেকে সবকিছু বিবেচনা করতে হবে। আবার সমবায়ীগণ নিজেদের আর্থসামাজিক অবস্থার গুণগত পরিবর্তনের জন্য আন্তরিকভাবে সমবায় সমিতির সাথে যুক্ত হবেন এবং লক্ষ্যপূরণে যুক্তিসংগতভাবে সেবাদাতার মধ্যে একটা নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন হলে আমাদের ইচ্ছাপূরণ সহজ হয়।

তাদের এই চলমানতায় কি স্বচ্ছতা রয়েছে? সমিতি নিবন্ধিত হবার পর তারা সঠিক পথে আছে কি না যেটা দেখার জন্য অডিট, পরিদর্শন, তদন্ত এবং তাদেরকে উজ্জীবিত করার জন্য প্রশিক্ষণ ও ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া নিয়মিত তদারকি সিস্টেম চালু রয়েছে। এ সকল কার্যক্রমের ফলে সমবায় সমিতির নেতৃবৃন্দের স্বার্থবাদী, ভোগবাদী ও অসংগত কাজ নিয়ন্ত্রণ করার তথ্য আমাদের অজানা। তবে দৃশ্যমান যেটা হয়, সেটা হলো সমবায়ের প্রতি সাধারণ মানুষের নির্লিপ্ততা এবং সমবায়ের পতাকাতলে সংগঠিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন প্রত্যাশা প্রতিয়মান হয়ে যাওয়া।

সমবায়ের সাফল্যে বাধাসমূহ

আমার দৃষ্টিতে কারণ হিসেবে যেটা ওঠে আসে, তাহলো-

যাপিত জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে আমরা কী চাই এবং কীভাবে চাই তার উত্তরটা প্রারম্ভেই জেনে নেয়া হয় না।

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য উদ্দেশ্য ব্যতীত গঠিত সমবায় সমিতি ভালো ফলাফল যে দিতে পারে না, তা জানা ও জানানো হয় না।

ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারে ও প্রভাব প্রতিপত্তির জোরে গঠিত সমবায় সমিতি কিংবা সমবায় সমিতিকে ব্যবহার করে শুধু ব্যবসায়িক কর্মসূচি অনুসরণ প্রকারান্তরে সমবায়ের মূল স্পিরিটকে যে বাধাগ্রস্ত করে সেটা আমরা সামনে আনি না।

সমবায় বিভাগের তদারকিতে গঠিত সমবায় সমিতির চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য উপস্থাপিত হয় না।

অসংগতি/অনিয়মের তথ্য সামনে আসলে কার্যকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও একপর্যায়ে আইনগত ও পারিপার্শ্বিক নানা জটিলতার কারণে বিষয়টি স্থবির হয়ে পড়ে।

সমবায় সমিতি গঠনপূর্ব পর্যবেক্ষণ, অবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয় না।

প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সমবায় সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমিতিকে বিবেচনায় না নিয়ে নতুনভাবে তাড়াহুড়া করে সমিতি গঠনের পরবর্তীতে এই সমিতিগুলো সমবায়ের ভাবধারায় আর টেকসই থাকে না। প্রকল্পভিত্তিক সমিতির কারণে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় রাখতে সমবায়ের নির্বাচন পদ্ধতি সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয় না। ব্যবস্থাপনা কমিটি অবৈধ্য হলেও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে নানা জটিলতা ভোগ করতে হয়।

আমরা সমবায়কে সহজ একটি প্রক্রিয়া বলে বিবেচনা করি। হ্যাঁ, সমবায় একটি সহজ প্রক্রিয়া, যেমন সাধারণ মানুষকে আমরা সহজভাবে বিবেচনা করি। কিন্তু সমিতি পরিচালনা কমিটির সদস্য এবং সমবায় বিভাগীয় কিছু কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক সমবায়ের আদর্শিক বিষয়ের চর্চা সম্পর্কে খুব একটা ধারণা দেয়া হয় না। ফলে সাধারণ্যে সমবায়টা সহজভাবে ধরা দেয় না।

সমবায় সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী

ইতিবাচক করতে প্রকাশনা ও প্রচারিক কার্যাদি খুব দুর্বল।

সবমায় এবং এনজিও যে এক নয় সেটা সাধারণ মানুষ জানে না বা জানানোর জন্য গৃহীত পদক্ষেপ উল্লেখযোগ্য নয়।

আন্তঃসমবায় সম্পর্ক জোরদার নয়। পাশাপাশি আরেকটা সমিতির সাথে যোগাযোগ নেই।

সামাজিক অবস্থান ও প্রয়োজন অনুযায়ী অথবা সমস্যার আলোকে সমাধান প্রত্যাশায় সম্মিলিতভাবে কিছু সংখ্যক মানুষ সমবায়ের পতাকাতলে আসেন। নিবন্ধন নেয়ার প্রাথমিক পর্ব শেষ হয়। এখন কাজে কর্মে সমবায়ের মূল চরিত্র রক্ষিত হচ্ছে কি না সেটা সমবায়ী, সমবায় নেতৃবৃন্দ এবং সমবায় বিভগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দেখতে হবে। উভয়ের আন্তরিক এবং সমন্বিত প্রয়াস ছাড়া সমবায় সমিতি হয়তো টিকে থাকবে, সমবায়ের বৈশিষ্ট্য থাকবে না। একটি সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে বহুসংখ্যক মানুষ জীবনমান উন্নয়নের একটি নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা অগ্রগামী হই। কিন্তু সেটা যদি মুষ্টিমেয় কয়েকজনের অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কেন্দ্র হয়, তাহলে সেই সমবায় আমরা চাই না।

সমবায়ের উন্নয়নে পারস্পরিক যোগাযোগ এবং করণীয়

আমরা পর্যবেক্ষণে দেখেছি- সমবায় সমিতির অধিকাংশ সদস্য সমবায় সম্পর্কে তেমন কিছুই জানেন না। তাদেরকে অনেক আশা-ভরসা দিয়ে সমবায় সমিতির সদস্য করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু শেয়ার সঞ্চয় জমা নেয়া হয়েছে, মাঝেমধ্যে একত্রিত করে সহি স্বাক্ষর নেয়া হয়। চড়াসুদে ঋণ দেয়া হয়, পরবর্তীতে শুধু ঋণ দেয়া-নেয়ার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়।

সাধারণত এই ঋণ কোনো প্রকল্প বা পরিকল্পনামাফিক হয় না ; অনুৎপাদনশীল বা ঘর গেরস্থালির কাজে ব্যবহারের জন্য দেয়া হয়। এরপর আদায়কারী সময়ান্তে তা আদায়ের জন্য সদস্যদের কাছে যান। এটা সমবায় আদর্শের কথা নয়। সবাই মিলে মিশে একাকার হয়ে সকল উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে সকল সুফল সমানভাবে ভোগ করার মধ্য দিয়েই সমবায়ের চরিত্র রক্ষিত হয়। আমরা এ ধরনের সমবায়ই চাই। আমাদের স্লোগান হোক "জীবনমানের উন্নয়ন করবো, সবাইকে উন্নয়নের পথ দেখাবো"। এক্ষেত্রে সমবায় সমিতি ও সমবায় অধিদপ্তর একযোগে কাজ করবে।

আমরা প্রায়শই দেখি- সমবায়ের সরকারি অফিস এবং সমবায় সমিতির মূল কেন্দ্রগুলো সমবায়ের ভাবধারাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেয়ে বাহ্যিক সাজসজ্জাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। এই সাজসজ্জা হতেই পারে, তবে এটা সাধারণ সমবায়ীদের প্রলুব্ধ করার জন্য কি না সেটা দেখতে হবে। সমবায়ীদের পরবর্তীতে উন্নত জীবন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা দিতে পারাটাই সমবায়ের সার্থকতা। বাহ্যিক সৌন্দর্য আমাদেরকে আত্মতৃপ্তি দিতে পারে, কিন্তু শারীরিক ও মানসিক তৃপ্তি দিতে প্রয়োজন আর্থিক উন্নয়ন।

জীবনমানের উন্নয়নের জন্য সমবায়কে যারা উপজীব্য করেছি এবং এই বিষয়টিকে দেখভাল করার দায়িত্বে যারা নিয়োজিত আছি তারা ঠিকঠাক দায়দায়িত্ব পালন করছি কি না এর আত্মসমালোচনা ও জবাবদিহিতা খুব জরুরি। আর যার কাজ তা যদি সঠিকভাবে পালন করা হয় তাহলে সমবায়ের মাধ্যমে সাফল্য নিশ্চিত।

সমবায় সমিতি গঠন, পরিচালনা ও আমাদের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে বাংলাদেশ সৃষ্টির মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নানামুখী দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি সমবায়ের মাধমে গণমানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নের স্বপ্ন দেখতেন। তাই বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও সমবায়ে উন্নয়ন" শীর্ষক ৫১তম জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে। উন্নত বাংলাদেশ গঠনে তিনি সমবায় পদ্ধতিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতেন। সে কারণে আমাদের দায়দায়িত্ব পালনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দুর্নীতিমুক্ত থাকতে তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন। সমবায় সমিতি ও দায়দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি এক জায়গায় বলেছিলেন-

"...একবার যদি একটা ডিস্ট্রিকে একটা কো-অপারেটিভে মানুষ দেখে যে, এই দেশের মানুষের উপকার হয়েছে, তাহলে আপনাদের আর কষ্ট করতে হবে না। তারা নিজেরাই এসে বলবে আমাদের এটা করে দাও- আমাদের করে দাও। ...একটা ট্রেনিং কোর্স, ট্রেনিং সেন্টার করুন। শেখে বই পড়ে ট্রেনিং হয় না। হলেও কম হয়। কেউ করে শেখে আর কেউ বই পড়ে শেখে। আর, সবচেয়ে যে বেশি শেখে যে করে শেখে। আপনারা করে শিখবেন। কাজ করে দেখিয়ে দিন, কিভাবে কাজ করতে হয়। বই পড়ে আমাদের একটা ফ্যাশন হয়েছে, ট্রেনিং সেন্টার করুন। কো-অপারেটিভ ট্রেনিং সেন্টার করে সেখানে সবাইকে নিয়ে যান। একমাস সেখানে ট্রেনিং হবে। সেখানে পেনশন খাইয়ে কি হবে? কি করবেন সেখানে? লেকচার?... কাজের জন্য আসতে হবে ময়দানে। আপনাদের কাজ করে শিখতে হবে। সেই জন্য আমাদের কো-অপারেটিভ। যদি কাজ করে শিখতে চান, যদি ভবিষ্যৎ অন্ধকার করতে না চান, তাহলে আমার কো-অপারেটিভ সাকসেসফুল করুন"।

আমরা বিশ্বাস করি- দায়িত্ববোধ থেকে কাজ করা হলে বহু সমস্যাও সামনে আসবে। সেটা দূরীভূত চেষ্টাও কাজের অংশ। যুগের সাথে তালমিলিয়ে চলার তাগিদ অনুভব করতে হবে। বসে থাকার সময় নেই। সবচেয়ে বড় কথা মানসিকভাবে দৃঢ় ও অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে।

মোট কথা, সমবায়ের সামগ্রিক প্রক্রিয়াতে জৌলুস কম, কিন্তু হৃদয়জ স্পন্দনের একটি চমৎকার মঞ্চ। আমরা যদি একটু পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখতে পাবো দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি সাধারণ মানুষ। তারা সাদামাটা জীবনযাপন করে দেশের সার্বিক জৌলুস বৃদ্ধিতে নিরলস কাজ করে চলেছেন। যদি জৌলুসটা দেখানোই প্রধান হয়ে দাঁড়ায় তবে সাধারণ মানুষের প্রকৃত চাওয়া কোনোদিন পূরণ হবে না। এই বিষয়টা যদি সমিতি ও সমবায়ের কর্ণধারগণ সঠিকভাবে উপলব্ধি করেন তবেই সমবায় সার্থক অবস্থানে যেতে পারবে। এটাই প্রত্যাশিত।

জয় হোক সমবায়ের।

অজয় কুমার সাহা: যুগ্ম নিবন্ধক (অবসর), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

জনসংখ্যাগত মুনাফা, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সমবায়

রাশিদা মুস্তারিন

বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে বহুল আলোচিত একটি বিষয় হলো জনসংখ্যাগত মুনাফা বা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড। এটিকে দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জনসংখ্যাগত মুনাফা বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বোঝায়? জনসংখ্যাগত মুনাফা হলো কোনো একটি দেশের মোট জনসংখ্যার ৫০% এর অধিক যখন শ্রম শক্তিতে পরিণত হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে পরনির্ভরশীল জনসংখ্যার চেয়ে কর্মক্ষম জনসংখ্যার হার বেশি হলে সে দেশটি জনসংখ্যাগত মুনাফার সুফল অর্জনের উপযোগী হয়। জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) জনসংখ্যাগত মুনাফা বা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডকে সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে "The economic growth potential that can result from shifts in a population's structure, mainly when the share of the working age population is larger than the non working age share of the population"

জনসংখ্যাগত মুনাফার সুফল স্বয়ংক্রীয়ভাবে পাওয়া যায় না। আর্থসামাজিক তথা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ এবং কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা অত্যাবশ্যক। রপ্তানির বহুমুখীকরণ, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিশ্চত করা অপরিহার্য। এসকল ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যথাযথভাবে বাজেট বরাদ্দের বিষয়ে সরকারের নীতি নির্ধারণ করা

প্রয়োজন। হংকং, সিংগাপুর, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন ও তাইওয়ান জনসংখ্যাগত মুনাফাকে কাজে লাগিয়ে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

চারটি ক্ষেত্রে জনসংখ্যাগত মুনাফার সুবিধা ভোগ করা যায়:

- দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে ওঠে
- উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রম সহজলভ্য হয়
- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটে
- সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়

বর্তমানে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ৬৫% এর বেশি লোক কর্মক্ষম। তাদের বয়স ১৫-৬৪ বছর। ৩৪% এর বয়স ১৫ বছর বা এর নিচে এবং ৬৫ বছর বা তার উর্ধ্বের জনসংখ্যা মাত্র ৫%। অর্থাৎ বাংলাদেশ জনসংখ্যাগত মুনাফার সুফল অর্জনের অবস্থায় উপনীত হয়েছে। নব্বই এর দশকে বাংলাদেশে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের আবির্ভাব ঘটে। ২০২১-২০৩১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সুফল ভোগ করতে পারবে। এ সুবিধা একটি দেশে বারবার আসে না। উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার জন্য এটিকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর কোনো বিকল্প নেই। দুইটি মাত্রায় ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সুফল পাওয়ার সুযোগ থাকে:

- যুবসমাজকে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তর করা।
- গড়ে উঠা মানব সম্পদকে পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে নিয়োজিত করা।

বাংলাদেশে বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ দুটি মাত্রা নিশ্চিত করতে হলে কর্মমুখী শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। আর কর্মমুখী প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সমবায় খাতের রয়েছে কার্যকরভাবে অবদান রাখার সুযোগ।

সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য সমবায় অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সর্বোচ্চ ও জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও এর আওতাধীন ১০টি আঞ্চলিক শিক্ষায়তনে অন্যান্য প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধনমূলক, তথ্যপ্রযুক্তি ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি সংক্রান্ত কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া প্রতিটি উপজেলা সমবায় কার্যালয়ে বিদ্যমান ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ দল কর্তৃক তৃণমূল পর্যায়ে আয়বর্ধক ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

সমবায় খাতকে সরকারের বাস্তবমুখী ও দূরদর্শী উদ্যোগে সামিল হতে হবে। কাল বিলম্ব না করে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিদ্যমান সমস্যা ও সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করে সেগুলো নিরসনসহ জনসংখ্যাগত লভ্যাংশের সুফল প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা সময়ের দাবী।

জনসংখ্যাগত মুনাফা-এর সর্বোচ্চ সুফল নিশ্চিত করতে সরকার ইতোমধ্যে জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি, ২০২২ প্রণয়ন করেছে। এ নীতিমালায় দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তুলতে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহের পাশাপাশি উক্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। এ নীতিমালায় ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০ মিলিয়ন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বেকারত্বের হার সর্বনিম্ন স্তরে নিয়ে আসার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

সরকার প্রণীত এ নীতিমালার সাথে সংগতি রেখে সমবায় একাডেমিসহ সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো কিভাবে অধুনিকায়ন করা যায় সে বিষয়ে সমবায় অধিদপ্তরকে নীতি নির্ধারণ করতে হবে। প্রতিষ্ঠানগুলোর ভৌত অবকাঠামো, প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম, প্রশিক্ষণ উপকরণ, দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে অতিসত্বর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও যথাযথ বাস্তবায়ন প্রয়োজন। উপজেলা পর্যায়ে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণের বাজেটসহ অন্যান্য সমস্যা নিরসন করা অত্যাবশ্যক। এছাড়া সমবায় অধিদপ্তর জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) এর সাথে সমঝোতার স্মারক স্বাক্ষর করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। ফলে প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন সহজতর হবে। ইতোমধ্যে আঞ্চলিক শিক্ষায়তন, নরসিংদী জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিকট হতে দক্ষ প্রশিক্ষণ প্রদানকারী হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

সমবায় খাতকে সরকারের এ বাস্তবমুখী ও দূরদর্শী উদ্যোগে সামিল হতে হবে। কাল বিলম্ব না করে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিদ্যমান সমস্যা ও সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করে সেগুলো নিরসনসহ জনসংখ্যাগত লভ্যাংশের সুফল প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা সময়ের দাবি। আর এ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে জনসংখ্যাগত মুনাফার সর্বোচ্চ সুফল নিশ্চিতের যাত্রাপথে সমবায় অধিদপ্তর হতে পারে সরকারের অন্যতম সহযাত্রী। ফলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে সমবায় অধিদপ্তর বিধিবদ্ধ কার্যক্রমের পাশাপাশি কর্মমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নয়ন অভিযাত্রায় সময়োপযোগী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

তথ্য সূত্র:

১. SANEM actionaid, August 2019, “Realising the Demographic Dividend through Investing on Young People in Bangladesh.”
২. The Daily Star: October 27, 2022, “Demographic dividend: Are we letting it pass us by?”
৩. The Daily Star: October 27, 2022, “Demographic dividend’ could turn into a’demographic disaster”

রাশিদা মুস্তারিন : যুগ্মনিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর।

নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়

সামিয়া সুলতানা

সভ্যতার অগ্রযাত্রায় পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সমান অবদান রেখে চলছেন। পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপরিচালনা- সর্বত্রই নারীদের প্রশংসনীয় ভূমিকা দৃশ্যমান। মা, বোন, স্ত্রী, কন্যা, বন্ধু, সহকর্মী- এমন নানা পরিচয়ে সাফল্যের অনুঘটক হিসেবে অগ্রণী তারা। তাই তো আমাদের জাতীয় ও বিদ্রোহী কবি বলেছেন-

"বিশ্বে যা কিছু সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর"।

নারীকে পিছনে ফেলে পুরুষের পথচলা হবে মন্থর। রুদ্ধ হবে যত মহাপরিকল্পনার পথ। জাতির উন্নয়নে নারীর রয়েছে আকাশ ছোঁয়া অবদান। তবে তাদের এই অবদান পুরুষশাসিত সমাজে মূল্যায়ন পায়নি। ফলে যুগে যুগে নারীরা হয়েছে অবহেলিত, নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও বঞ্চিত।

বাংলাদেশে নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া। তাঁর হাত ধরেই বাংলার অবহেলিত, বঞ্চিত ও পিছিয়ে থাকা নারীরা স্বপ্ন দেখতে শিখেছে। বেগম রোকেয়াই প্রথমবারের মতো বাঙালি মুসলিম সমাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীর সমান অধিকারের দাবি তুলে ধরেন এবং নারী স্বাধীনতার পক্ষে নিজের মতামত প্রচার করে। সেই সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আমরা অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি। বাংলাদেশ সরকার নারীদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষায় অবারিত সুযোগ তৈরি করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করেই নারীদের সমাজের বিভিন্ন স্তরে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে নারীর ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্ত করেন। গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তা, মেয়েদের শিক্ষাব্যবস্থা, চাকরিতে নারীর অধিকার, রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও সাফল্যের নমুনা দেখিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমবায় বিভাগও নারী উন্নয়নে ও নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করে যাচ্ছে।

১৯০৪ সালে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরুর পর হতে অদ্যাবধি নানা শ্রেণি পেশার মানুষ নানা শ্রেণির সমবায় গড়ে তুলেছে। বিদ্যমান সমবায় সমিতি আইন মোতাবেক মহিলা সমবায় সমিতিসহ ২৯ প্রকারের সমবায় রয়েছে। বাংলাদেশে মোট সমবায়ের সংখ্যা ১,৭৪,৩৯৪ এর মতো। এসব সমিতির সদস্য রয়েছে প্রায় ২ কোটি। ২ কোটি সমবায়ীর মধ্যে প্রায় ৭৫ লক্ষ জন নারী রয়েছে, যাদের শেয়ার ও সঞ্চয়ের মোট পরিমাণ ২০ কোটি টাকা। এসব নারীদের মধ্যে স্ব-কর্ম, উদ্যোক্তা ও সফল ব্যবসায়ী রয়েছে। সমবায়ের মাধ্যমে সৃষ্টি হচ্ছে নারী নেতৃত্ব। সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত "নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়- অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা" গবেষণাপত্রে দেখা যায় সমবায় সমিতিতে যুক্ত হয়ে নারী সদস্যগণ তাদের আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। যা নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে দেখা যায়, ৯৭% নারী সমিতির সদস্য হওয়াতে সর্বোচ্চ মাসিক আয় বৃদ্ধির পরিমাণ ৭০,০০০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ৫০ টাকা। আর সদস্য প্রতি গড় মাসিক আয় বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ৬,৬০০ টাকা।

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক সমবায়ভিত্তিক বেশ কিছু প্রকল্প ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। নারীদের উন্নয়নে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত একটি সফল প্রকল্প এবং উক্ত প্রকল্পের আওতায় গঠিত একটি সমবায় সমিতির সাফল্যগাঁথা তুলে ধরা হলো।

"উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প:

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক "উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে

সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি উন্নত শংকর জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের জন্য লাভজনক আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদিত দুধের বাজার সুবিধা সৃষ্টি, কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গাভির জাত উন্নয়ন, জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহারে উৎসাহিতকরণ, গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতায়ন ইত্যাদি উদ্দেশ্য নিয়ে জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১ মেয়াদে ১,৫১,৫৭.০৩ টাকা ব্যয়ে দারিদ্র্য ম্যাপ অনুযায়ী নির্বাচিত ২৫টি জেলার ৫০টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১০,০০০ জন সদস্যকে ১২০ কোটি টাকার সম্পদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটির উপকারভোগী হলো প্রকল্প এলাকায় গঠিত ১০০টি সমবায় সমিতির বিদ্যমান ও ভবিষ্যৎ সদস্যগণ যারা এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা, কর্মক্ষম, পরিশ্রমী, নিজ ঘরে বসবাসকারী ইতিবাচক মনোভাবাপন্ন সুবিধাবঞ্চিত মহিলা। প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী ১০,০০০ জন সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের প্রশিক্ষণ, তদারকি, গবাদি পশুর চিকিৎসা বিনামূল্যে দেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পভুক্ত ক্রয়কৃত প্রায় ১৪,০০০ গাভি দৈনিক গড়ে ৬.৫০ লিটার দুধ দিচ্ছে। দুধ বিক্রয়লব্ধ অর্থ একদিকে সুবিধাবঞ্চিত নারীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলছে, সংসারে তাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে, অন্যদিকে দেশের দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। প্রকল্পটির মেয়াদ শেষান্তে আবর্তক তহবিল হিসেবে বর্তমানে কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

গঙ্গানন্দপুর নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

"গঙ্গানন্দপুর নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার গঙ্গানন্দপুর গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের নিয়ে "উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৭ সালে নিবন্ধিত হয়। নিবন্ধনকালীন সময়ে সমিতিটি ১০০ জন নারীকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১২৫ জন। সমিতি নিবন্ধনের পর ১০০ জন সদস্যকে ২টি করে বকনা/গাভি কেনার জন্য ১,০০,০০০ টাকা এবং গো-খাদ্য ও আনুষঙ্গিক ব্যয়ের জন্য মোট ১,২০,০০০ করে সর্বমোট ১,২০,০০,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। প্রকল্প শেষে আবর্তক হিসেবে হস্তান্তর এর সময় স্থিতি ছিল ৯১,৬১,০০০ টাকা। প্রথম পর্যায়ের আদায়ের হার প্রায় ৭৭%। প্রথম পর্যায়ে প্রকল্প হতে গৃহীত ঋণ সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করায় পরবর্তীতে ৬৪ জন সদস্যকে আবর্তক তহবিল হিসেবে ১,০০,০০০ টাকা করে ৬৪,০০,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে বিগত ১৩/১২/২২ খ্রি. তারিখে আবর্তক তহবিল হতে পুনরায় ৫৫ জন সদস্যকে ৫৫,০০,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। বিগত ১৮/১২/২৩ খ্রি. তারিখ সুযোগ হয়েছিল আলোচ্য সমিতি পরিদর্শনের সুযোগ হয়েছিল।

গঙ্গানন্দপুর গ্রামে গিয়ে একটি অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখতে পেলাম। প্রতিটি বাড়িতেই গাভি পালনের জন্য গোয়ালঘর রয়েছে। ২-৩টি করে গাভি সবারই আছে। মহিলারা নিজের সন্তানের মতো গাভির যত্ন নেন। কেউ দুধ বিক্রয়ের জন্য গরু পালন করছেন আবার কেউ লাভের জন্য ছোট বকনা বাছুর কিনে লালনপালন করে ভালো লাভে বিক্রয় করেন। গাভি পালনের মাধ্যমে এলাকার মানুষ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। প্রতিটি বাড়ি আর তাদের ব্যবহৃত বাথরুমের বাহ্যিক অবস্থাই প্রকাশ করছে তাদের সচ্ছলতার কথা। এক কথায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি একটি সচ্ছল গ্রাম গঙ্গানন্দপুর।

সমিতির সদস্য কয়েকজন মহিলার সাথে আলাপ হয়। ঝরনা বেগমের স্বামী এলাকার দরিদ্র সবজি ব্যবসায়ী। স্বামীর একার আয়ে তাদের সংসার চালানো কঠিন ছিল। সমিতি থেকে স্বল্প সুদে ১,২০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে প্রথম পর্যায়ে দুইটি গাভি কেনেন। কিছুদিন পর একটি গরু বিক্রয় করেন এবং একটি গরু বাছুর দেয়। তিনি সফলভাবে ঋণ পরিশোধ করেন এবং পরবর্তীতে আবর্তক তহবিল হতে ১,০০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে পুনরায় দুইটি গাভি কিনেন। বর্তমানে ঝরনা বেগম আর্থিকভাবে সচ্ছলতার মুখ দেখছেন। তিনি খুবই আনন্দিত এই সমিতির সদস্য হতে পেরে।

কথা হলো আরেক সদস্য ডলি বেগমের সাথে। স্বামী পোল্টি ফার্মের কর্মচারী। গরু পালনের আগে তাদের টিনের ঘর ছিল। বর্তমানে একতলা পাকা ঘর করেছেন। ডলি বেগমের স্বামী জানালেন তার স্ত্রী সমিতির সদস্য হলে গাভি কেনার জন্য ঋণ পান। উক্ত ঋণের টাকায় গাভি ক্রয়ের মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছেন এবং সংসারে সচ্ছলতা এনেছেন।

আরেক সদস্য আর্জিনা বেগমের সাথে আলাপ হয়। অল্প বয়সি মেয়ে আর্জিনা সমিতির সদস্য হয়ে ১,২০,০০০ টাকা লোন নেয় এবং দুইটি গাভি কিনে। আর্জিনা ও তার ভাইয়ের মিলিত চেষ্টায় তারা সফলভাবে ঋণ পরিশোধ করে এবং পুনরায় আবর্তক তহবিল হতে ১,০০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে আরও দুইটি গাভি ক্রয় করে। গাভির দুধ বিক্রয় করে তারা অর্থনৈতিকভাবে আগের চেয়ে ভালো আছেন।

বর্তমানে ঝিকরগাছা উপজেলার মানুষের মধ্যে "গঙ্গানন্দপুর নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ" এর কার্যক্রম আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। দরিদ্র নারীদের একটি আয়ের পথ সৃষ্টি করেছে সমিতি প্রদত্ত ঋণ। সমিতির সদস্যদের আর্থিক সচ্ছলতা দেখে এলাকার অন্যান্য মহিলারাও সমিতির সদস্য হতে আগ্রহী। সমিতির সদস্য হলে তারা স্বল্প সুদে ঋণ পাচ্ছে তাই সহজেই ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে।

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক "উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে গঠিত "গঙ্গানন্দপুর নারী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ" একটি সফল ও আদর্শ সমিতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই সাথে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখাসহ নারীদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটছে।

বাংলাদেশের নারীদের সমবায় আন্দোলনের সাথে অধিকতর সম্পৃক্তকরণের ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। ভবিষ্যতে নারীর ক্ষমতায়নের নতুন নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে প্রকল্প প্রণয়ন করা হলে বৃহত্তর পরিসরে সমবায়ের মাধ্যমে ভূমিকা রাখতে পারবে।

সামিয়া সুলতানা: উপনিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর।

সমবায়ের সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ

প্রেক্ষাপটে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিসমূহ

মোঃ সেলিমুল আলম শাহিন

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে বাংলাদেশ দূর্বারগতিতে আজ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সীমানায় এসে পৌছেছে। ১৯৭২ সালে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরপর একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পেয়েছিলেন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। অর্থনৈতিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত এবং অবকাঠামোগত ভেঙে পড়া একটি দেশের দায়িত্ব যখন তিনি গ্রহণ করলেন, তখন দেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে খাদ্যের জন্য হাহাকার চলছিল। জাতির পিতা বুঝতে পেরেছিলেন, এই দেশকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে হলে সমবায়ভিত্তিক উন্নয়ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা ব্যতীত অন্য কোনো উপায় নেই। ১৯৭২ সালের ৩ জুন বংলাদেশ জাতীয় সবায় ইউনিয়ন কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে'। তিনি আরো বলেন, 'আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন। কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান'। তিনি গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙা করতে এবং কৃষিকে শক্তশালী করতে সমবায়ভিত্তিক কৃষিবিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। দেশের অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে সমবায়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে জাতির পিতা ১৯৭২ সালে প্রণীত দেশের সংবিধানে সমবায় মালিকানাকে সম্পদ মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি দেন। অর্ধশত বছর পেরিয়ে বর্তমান বাংলাদেশ নতুন সম্ভাবনা ও সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে, বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। বৈশ্বিক অর্থনীতির ভঙ্গুরতা, গ্রামীণ ক্ষয়িষ্ণু অর্থনীতি, অপরিকল্পিত নগর ও গ্রামীণ উন্নয়ন, কোভিড-১৯ সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলাসহ নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। ১৯৭২ সালে একটি দেশকে গড়ে তোলার জন্য সমবায়ভিত্তিক পরিকল্পনা যেমন আবশ্যক ছিল, তেমনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা সংকট মোকাবেলা করে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সুসংহত করতে সমবায়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা খুবই প্রাসঙ্গিক।

প্রেক্ষাপট: জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিসমূহ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে 'অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' এগিয়ে যাচ্ছে উন্নয়নের মহাসড়কে। ইতোমধ্যে সরকার দেশের ১০০ বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনা ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ প্রণয়ন করেছেন। অর্থাৎ টেকসই উন্নয়নের পথে দেশ একটি রূপরেখা ধরে এগিয়ে চলেছে। এই উন্নয়ন রূপরেখার প্রথম মাইলফলক ভিশন ২০২১। এর পরে ২০৪১ সনের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়। ২০৪১ সনের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা মূলত ২০ বছরব্যাপী দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, যা চারটি মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। বাংলাদেশের এই মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনাগুলোই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা না অভিহিত। বর্তমানে বাংলাদেশ ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসরণ করছে যা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। আর প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলো আন্তর্জাতিক The UN

2030 Agenda for Sustainable Goals and Targets গুলো অর্জন করার লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। এই সকল পরিকল্পনা ও নীতিসমূহের আলোকে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের জন্য উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে, যা দেশের বাজেটের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত।

বাংলাদেশের এই উন্নয়ন অভিযাত্রায় যে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরকিল্পনা/নীতিসমূহ অনুসরণ করা হচ্ছে, তা ধারাভিকভাবে তুলে ধরা হলো-

ক. টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০
খ. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১
গ. পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসমূহ
ঘ. ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০
ঙ. সেক্টর স্ট্র্যাটেজি পেপারস

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১৭টি লক্ষ্যকে লক্ষ করলে দেখা যায়, এতে দারিদ্র্য বিমোচনের কথা বলা হয়েছে, ক্ষুধামুক্তির কথা বলা হয়েছে, সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণের কথা বলা হয়েছে, গুণগত শিক্ষার কথা বলা হয়েছে, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণের কথা বলা হয়েছে, গ্রামীণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে, গ্রামীণ শিল্প উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে, অসমতা হ্রাস করার কথা কথা বলা হয়েছে, টেকসই আবাসনের কথা বলা হয়েছে; বলা হয়েছে পরিবেশ রক্ষা, জলাবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার স্থানীয় কমিউনিটির অংশগ্রহণের কথা। যেখানে বৈশ্বিক উন্নয়নের অন্যতম নিয়ামক হয়ে দাঁড়িয়েছে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ, সেখানে সমবায় ব্যতীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার লক্ষ্যসমূহ পূরণে আর কি বিকল্প থাকতে পারে? কেননা সমবায় সকলের সমবেত অংশগ্রহণের কথা বলে, নিজেদের অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বলে, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার কথা বলে; কেননা সমবায় গণতন্ত্রের কথা বলে, সকল ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। সমবায় একটি শক্ত প্লাটফরম যেখানে অবহেলিত, দরিদ্র তথা সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষেরা একই ভাষায় কথা বলতে পারে এবং নিজেদের সকল অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যার নিজস্ব ঢং এ সমাধান করতে পারে।

এবার আসি আমাদের প্রেক্ষিত পরিকল্পনার কাছে। কি বলা হয়েছে এতে? বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা মূলত রূপকল্প ২০২১ এর উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয়েছে; যেখানে দুইটি প্রধান অভীষ্টের কথা বলা হয়েছে-

ক. ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত দেশ, যেখানে বর্তমান মূল্যে মাথাপিছু আয় হবে ১২,৫০০ মার্কিন ডলারেরও বেশি এবং যা হবে ডিজিটাল বিশ্বের সাথে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ।

খ. বাংলাদেশ হবে সোনার বাংলা, যেখানে দারিদ্র্য হবে সুদূর অতীতের ঘটনা।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ লক্ষ করলে দেখা যায়, এখানে উচ্চ প্রবৃদ্ধি, কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাসের কথা দ্রর্থহীনভাবে বলা হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক লক্ষ্যমাত্রাগুলোর সাথে একই সুরে কথা বলে। এই প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় জ্যামিতিক লভ্যাংশ সুবিধা ব্যবহার করে মানব উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে, পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে টেকসই কৃষির কথা বলা হয়েছে, গ্রামীণ শিল্পায়নের মাধ্যমে নগর-গ্রামের বৈষম্য দূরীকরণের কথা বলা হয়েছে, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও কর্মসৃজনের কথা বলা হয়েছে, টেকসই নগরায়ণ ও আবাসনের কথা বলা আছে। বলা আছে টেকসই জ্বালানি ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত অভিঘাত মোকাবেলা করার কথা; বলা আছে সুনীল অর্থনীতির মতো রূপরেখাও। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০৪১ তে উল্লিখিত 'কাউকে পিছনে নয়' এর উপর ভরসা করে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানাতে চাই,

> ১৯৭২ সালে একটি দেশকে গড়ে তোলার জন্যে সমবায়ভিত্তিক পরিকল্পনা যেমন আবশ্যক ছিল, তেমনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা সংকট মোকাবেলা করে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সুসংহত করতে সমবায়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা খুবই প্রাসঙ্গিক।

এই লক্ষ্যসমূহ যথাযথ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমবায়ের সংশ্লিষ্টতা অতি জরুরি।

প্রেক্ষিত পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় আসে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। বর্তমানে আমরা ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা-২০২০-২০২৫ অনুসরণ করছি। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার হাত ধরে ধরে আমরা প্রেক্ষিত পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ অর্জন করার চেষ্টা করছি। পরিকল্পনা দর্শন অনুযায়ী চলমান চ্যালেঞ্জগুলোকে মোকাবেলা সংক্রান্ত পদক্ষেপসমূহ মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনায় স্থান পাবে; সেদিক থেকে বিবেচনা করলে ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অত্যন্ত কার্যকর বলেই মনে হয়। ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কোভিড-১৯ পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার সর্বোচ্চ গুরুত্ব পেয়েছে। এই পরিকল্পনাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এখানে কর্মসংস্থান, শ্রম উৎপাদনশীলতার কথা বলা হয়েছে; ক্ষুদ্র ঋণ সম্প্রসারণ, আয় বৈষম্য দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং সামাজিক সুরক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়নে অগ্রগতি [স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ] এর কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে বিদ্যুৎ ও প্রাথমিক জ্বালানি, পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অগ্রগতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার কথা। পানি সম্পদ, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য পরিবেশগত ঝুঁকির সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য ৮ম পরিকল্পনায় বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনার (বিডিপি ২১০০) কার্যকর বাস্তবায়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

এগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৬টি মূল বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে-

মানবস্বাস্থ্য, আত্মবিশ্বাস, কর্মসংস্থান, আয় ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে কোভিড-১৯ থেকে দ্রুত পুনরুদ্ধার।

জিডিপি প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও দ্রুত দারিদ্র্য হ্রাসকরণ। ২০২৫ সালে প্রবৃদ্ধির হার ৮.৫% এ উন্নীতকরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। গড় উৎপাদনশীলতা প্রবৃদ্ধি হারের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে

৫.৬%। দারিদ্র্যের হার ২০১৯ এর ২০.৫% থেকে কমিয়ে ২০২৫ নাগাদ ১৫.৬% এবং অতি দারিদ্র্যের হার ২০১৯ এর ১০.৫% থেকে ৭.৪% এ নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

উন্নয়নপ্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণরূপে অংশগ্রহণের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের ক্ষমতায়নে এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে সুবিধাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে এবং দারিদ্র্য ও ঝুঁকিগ্রস্তদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক বিস্তৃত কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

একটি টেকসই উন্নয়ন পথনকশা প্রণয়ন করা, যা দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় সক্ষম, যা প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করবে এবং যা অবশ্যম্ভাবী নগরায়ণকে সফলভাবে ব্যবস্থাপনা করবে।

২০৩১ সাল নাগাদ উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনের পথে অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজনীয় উন্নয়ন ও সংস্কার সাধন।

এসডিজির অভীষ্ট অর্জন এবং এলডিসি থেকে উত্তরণের প্রভাব প্রশমন।

বৈশ্বিক গবেষণায় দেখা গেছে, কিছু কিছু নীতি অসমতা হ্রাসে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুবিধা, গুণগত শিক্ষায় সর্বজনীন অভিগম্যতা, দরিদ্র পরিবারগুলোতে নগদ অর্থ সরবরাহ, পল্লী অবকাঠামো, বিশেষ করে রাস্তাঘাট ও বিদ্যুতায়ন। সে অনুযায়ী ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দরিদ্রবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির কৌশলের মধ্যে ৭টি প্রধান বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে-

- শ্রম নিবিড়, রপ্তানিমুখী ম্যানুফ্যাকচারিং নির্ভর প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিতকরণ;
- কৃষি বহুমুখীকরণ
- কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে গতিশীলতা আনয়ন
- আধুনিক সেবা খাতকে শক্তিশালীকরণ
- খাতবহির্ভূত সেবাসমূহের রপ্তানি বৃদ্ধিকরণ
- আইসিটিনির্ভর উদ্যোগ ত্বরান্বিতকরণ
- বৈদেশিক কর্মসংস্থান শক্তিশালীকরণ

উপরের পরিকল্পনাসমূহের লক্ষ্য, উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রতিটি দপ্তরের করণীয় উল্লেখ করা হয়েছে; সমবায় অধিদপ্তর এর ব্যতিক্রম নয়। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের জন্য নির্ধারিত প্রধান উদ্দেশ্যাবলি হলো:

১. কর্মসংস্থান বাড়ানো ও আয় সৃজনের লক্ষ্যে গ্রামীণ প্রবৃদ্ধি ও অর্থনীতির বহুমুখীকরণ ত্বরান্বিতকরণ;

২. ঝুঁকিগ্রস্ত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে দারিদ্র্য হার কমিয়ে আনা;

৩. দরিদ্র অঞ্চলের প্রতি বিশেষ নজর দেয়ার মাধ্যমে জেলাগুলোর মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন নিশ্চিত করা;

৪. আর্থিক সম্পদ সৃষ্টি ও উৎপাদন কার্যক্রমে সমবায়ের কর্মকান্ড উৎসাহিতকরণ; এবং

৫. কৃষিপণ্যের বিপণনের জন্য কৃষক, অকৃষি খাতে নিয়োজিত কর্মী এবং বাজারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন।

এই আলোকে সমবায় অধিদপ্তরের জন্য অগ্রাধিকারভুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে কেবল গ্রামীণ জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও টেকসই কৃষি-খাদ্য নিরাপত্তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমবায় অধিদপ্তরের করণীয়গুলো অনেকক্ষেত্রেই অলক্ষ্যে রয়ে গেছে। সমবায় অধিধপ্তরের অন্যতম বড় শক্তি হলো- জনসম্পৃক্ততা। প্রতিট গ্রামে গ্রামে এবং নগরে নগরে সমবায় সমিতি বিদ্যমান। সারা দেশে প্রতি ১৮ জনে একজন সমবায় সমিতির সদস্য। আজকাল উন্নয়ন পরিকল্পনায় যে গণমানুষের অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে, তার শত বছরের পুরানো চর্চার নাম সমবায়। কেবলমাত্র সামাজিক সংঘবদ্ধতার কথা নয়, সমবায়ের সাথে রয়েছে অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততা। বাংলাদেশে মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৯৬,৩১৬টি (তন্মধ্যে প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা ১,৯৫,০৮৬টি, জাতীয় সমিতি ২২টি এবং কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যা ১,২০৮টি)। এই সমবায়গুলোর মোট কার্যকরী মূলধন প্রায় ১৫,৪৪,২৫৪.৫১ টাকা। অর্থাৎ একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে জনবল ও জনঅর্থ নামক দুইটি উপাদান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তার দুইটিই সমবায় অধিদপ্তরের জন্য প্রাসঙ্গিক। সংগতকারণে এসডিজি, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরের কর্মক্ষেত্র আরো বিস্তৃত করা প্রয়োজন এবং সমীচীন। অন্যভাবে বলা যায়, বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের সাথে সমবায় অধিদপ্তরের নানা কার্যক্রমের চলমান গ্যাপ কমিয়ে আনা জরুরি। তাহলে সমবায় অধিদপ্তর আর কি কি ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করতে পারে? তা আলোচনা করতে পারি।

ক) খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই কৃষি: আমি খাদ্য উৎপাদনের কথা বলছি না; তার জন্য কৃষি বিভাগ রয়েছে। আমি খাদ্য নিরাপত্তার সাথে জড়িত টেকসই বিপণনের কথা বলছি। সারা বাংলাদেশের যে বিস্তৃত সমবায় নেটওয়ার্ক রয়েছে; তার মাধ্যমে টেকসই বিপণন অবকাঠামো- ভ্যালু চেইন ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের সকল শ্রেণির মানুষের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঠিক এই পন্থাতেই দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। এক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরের অধিকতর কাজ করার সুযোগ ও সুবিধা রয়েছে এবং সেই লক্ষ্যেই সমবায় অধিদপ্তরের কাজ বিস্তৃত করা অত্যন্ত জরুরি।

খ) মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ: একদম গ্রাম পর্যায়ে জরুরি স্বাস্থ্য সেবাখাতে সমবায় বিভাগের সম্পৃক্ততার সময় এসেছে। ইতোমধ্যেই কমিউনিটি হেলথ কার্যক্রম চলমান রয়েছে কিন্তু তার সঠিক ব্যবস্থাপনা ও বিস্তৃতির জন্য অংশগ্রহণমূলক সমবায়ের সম্পৃক্ততা একটি সময়ের প্রয়োজন। গ্রামপর্যায়ে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ প্রকল্পের সফলতার জন্যে কমিউনিটির সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অংশগ্রহণ ব্যতীত অন্য কোনো বিকল্প নেই।

গ) গ্রামীণ শিল্প উন্নয়নে সমবায়: বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির সাম্প্রতিক গবেষণায় গ্রামীণ শিল্প উন্নয়নে সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা ওঠে এসেছে এবং একই সাথে এই ক্ষেত্রে সমবায়ের দুর্বল সম্পৃক্ততার বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। সমবায়ের মাধ্যমে মূলধন গঠনপূর্বক গঠনতান্ত্রিকভাবে সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়ে তোলা এবং বিপণন করা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। কেবলমাত্র শিল্পক্ষেত্রে সমবায় সম্পৃকতার জরিপ কষে এক্ষেত্রে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে সমবায় নির্ভর শিল্পের অনুপাত বৃদ্ধি করা দরকার।

ঘ) টেকসই আবাসন: নগর আবাসনের ক্ষেত্রে তো বটেই, গ্রামীণ আবাসনের অবস্থাও বেশ সংকটপূর্ণ। স্পষ্ট তথ্য উপাত্ত বাদেই কেবল বাহ্যিক দৃষ্টি থেকে বুঝা যায়, দরিদ্র মানুষেরা টেকসই আবাসনের ধারে কাছেও নেই, যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের অন্যতম টার্গেট। সমবায়ের মাধ্যমে কমিউনিটিভিত্তিক আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সরকারের আশ্রয়ণ প্রকল্প একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। নগর ও গ্রামীণ আবাসন; উভয়ক্ষেত্রেই সমবায় সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। 'টেকসই আবাসন নিশ্চিত করা' সমবায় অধিদপ্তরের কাছে একটি সময়ের দাবি। সমবায় অধিদপ্তরের নীতিমালায় বিষয়টি গুরুত্বের সাথে স্থান পেতে পারে। মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সমবায় অধিদপ্তর গুরুত্বের সাথে টেকসই আবাসন বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। ইতোমধ্যে সমবায়ভিত্তিক যে নগর আবাসন গড়ে উঠছে তা একান্তই বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরকে একটি সামগ্রিক নীতিগত ভূমিকা গ্রহণ করা জরুরি।

ঙ) সেবা খাতে সমবায়: ব্যাংক বীমা, পরিবহন প্রভৃতি সেবা খাতে সমবায় অর্থায়নের পর্যাপ্ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কোনো এক অজানা কারণে তা গতি পাচ্ছে না। কেবল পুঁজিবাদের উপর নির্ভর করে নয়; সকলের কল্যাণার্থে এসকল সেবা খাতে সমবায়নির্ভর বিকল্প ভাবার সময় এসেছে।

চ) জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা: জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বের ৭ম ভঙ্গুর একটি দেশ। এদেশের ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থানের কারণেই এখানে প্রতিবছর নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ধেয়ে আসে। ফলে দেশের দরিদ্র মানুষ আরো বেশি দরিদ্র হয়ে পড়ছে। দুর্যোগ প্রতিরোধ বিজ্ঞান বলে, জলবায়ু পরিবর্তনের ভঙ্গুরতা হ্রাস করতে হলে জনগণের আর্থিক ও সামাজিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। প্রশ্ন হলো, দরিদ্র মানুষের এই আর্থিক ও সামাজিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হলে সমবায় ভিন্ন আর কি টেকসই-পদ্ধতি বর্তমান আছে? যদি আর কোনো সহজ পদ্ধতি না থাকে, তবে কেন আজও সমবায় অধিদপ্তর এক্ষেত্রে নিজেদের কর্মকাণ্ড প্রসারিত করছে না; যা একটি বৈশ্বিক চাহিদা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতির গুরুত্ব অনুধাবন করে সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলা সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করা এখন সময়ের প্রয়োজন।

ছ) প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ: বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। স্বাভাবিকভাবেই অতিরিক্ত জনবলের কারণে এর প্রাকৃতিক সম্পদ টেকসই সংরক্ষণ সম্ভব নয়। ফলে প্রতিনিয়ত এদেশের নদনদী, খালবিল, বনভূমি, পানিসম্পদ বিনষ্ট হচ্ছে। অন্যভাবে বলা যায় এই প্রাকৃতিক সম্পদ সুষ্ঠুভাবে বা টেকসই উপায়ে ব্যবহৃত হচ্ছে না। পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা (পাবসস) নিয়ে সমবায় কাজ করলেও সেটি মূলত এলজিইডি'র প্রকল্প। এটি সমবায়ের সরাসরি উদ্যোগ নয়। এখানে একটি ভাবনার বিষয় হলো, যেখানে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন সহযোগীগণ সমবায়ভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য হন্যে হয়ে ছুটছে, সেখানে স্বয়ং সমবায় অধিদপ্তর পুরোপুরি নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে। এক্ষেত্রটি বাছাই করে সময়োপযোগী প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সমবায় বিভাগ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতে পারে।

এর বাইরেও কমিউনিটির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সমবায় উদ্যোগের কোনো বিকল্প নেই। দেখা গেছে যে, কমিউনিটির সক্ষমতা বৃদ্ধি ব্যতীত কোনো উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করলে তা বেশির ভাগই কার্যকর হয় না। গ্রামীণ অর্থনীতি সুসংহত করে আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি।

শেষকথা

সমবায় বিভাগের জন্য নতুন নতুন ক্ষেত্রের হাতছানি যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে চ্যালেঞ্জও। আশা করি, সমবায় বিভাগ তার নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি এই সকল নতুন কর্মক্ষেত্রে কাজ করতে সক্ষম হবে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। শেষ করতে চাই একটি কবিতা দিয়ে, সেখানে বলা হয়েছে মানুষ অপার ক্ষমতার উৎস। মানুষকে ক্ষুদ্রার্থে নেবার সুযোগ নেই। সমবায় সেই মানবসম্পদ নিয়ে কাজ করে। দেশের টেকসই উন্নয়ন চাইতে হলে আমাদেরকে সেই মানুষ ও সমবায়ের কাছেই ফিরে যেতে হবে। এছাড়া অন্য কোনো বিকল্প আছে কি!

'মানুষকে এত ক্ষুদ্রার্থে নেবেন না,
মানুষ এত বড় যে,
আপনি যদি 'মানুষ' শব্দটি
একবার উচ্চারণ করেন
যদি অন্তর থেকে করেন উচ্চারণ
যদি বোঝেন এবং উচ্চারণ করেন 'মানুষ'
তো আপনি কাঁদবেন।
আমি মানুষের পক্ষে,
মানুষের সঙ্গে এবং মানুষের জন্যে'।

(কবি ভাস্কর চৌধুরী)

গ্রন্থ সহায়তা

১. সমবায় অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২১
২. টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০
৩. বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১
৪. বাংলাদেশের ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০২১-২৫
৫. বাংলাদেশের ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০

মোঃ সেলিমুল আলম শাহিন: অধ্যক্ষ-উপনিবন্ধক, আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নওগাঁ

তরুণদের ভাবনায় সমবায়

মোঃ আল-আমিন

বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস অত্যন্ত সমৃদ্ধ। উপমহাদেশে ১৯০৪ সালে কৃষিঋণ আইনের মাধ্যমে সমবায় ব্যবস্থা চালু হয়। সমবায় ধারণার প্রসার এবং প্রচারের সার্বিক দিক বিবেচনা করে ১৯১২ সালে সমবায় বিষয়ক আইন প্রণীত হয়। উপমহাদেশে সমবায় ব্যবস্থা প্রণয়নে গোঁড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, কামিনী রায়, কাজী নজরুল ইসলাম, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এর অবদান অনস্বীকার্য। ক্রমান্বয়ে সমবায়ের হাল ধরেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ড. আখতার হামিদ খানসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। ১৯৪৯ সালের শেষ দিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান "পাটগাতী ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ" এর সদস্য হন। সমবায়ের উন্নয়ন ধারণা বঙ্গবন্ধুকে আকৃষ্ট করলে, তিনি এর ব্যাপকতা উপলব্ধি করেন। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৫৪ সালের ১৫ মে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে "কৃষিঋণ, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন" বিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।

সমবায়ের মাধ্যমে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব বলে মনে করতেন জাতির পিতা, যার প্রতিফলন হিসেবে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায়, বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে "মালিকানার দ্বিতীয়" খাত হিসেবে সমবায়কে যুক্ত করা হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়কে শুধু সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়েই সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি গ্রাম উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং শোষিত মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমতাভিত্তিক উন্নয়ন দর্শনের আওতায় সমবায়কে অন্যতম কৌশলগত হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। মূলত সমবায়ের মাধ্যেম ব্যক্তিকেন্দ্রিক মালিকানার পরিবর্তে যৌথ মালিকানা তথা সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের অংশগ্রহণমূলক উন্নয়নই ছিল জাতির পিতার উন্নয়নের মূল মন্ত্র।

সমবায় আন্দোলনকে বেগবান করতে কতগুলো মূলনীতি রয়েছে, বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলনের মূলনীতিগুলো হলো- একতা, সাম্য, সহযোগিতা, সততা, বিশ্বাস, গণতন্ত্র ও সেবা। আন্তর্জাতিক সমবায়ের ক্ষেত্রেও কিছু মূলনীতি রয়েছে, এগুলো হলো- স্বতঃস্ফূর্ত ও অবাধ সদস্যপদ, সামাজিক অঙ্গীকার, সদস্যের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, সদস্যের আর্থিক অংশগ্রহণ, আন্তঃসমবায় সহযোগিতা, স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও তথ্য। বাংলাদেশে সমবায় আন্দোলনকে গতিশীল করার জন্য তরুণ জনগোষ্ঠীর উপর দৃষ্টি আরোপ করে, সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধের আলোকে মূলনীতিসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক উন্নয়নের জন্য তরুণ জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত ছাড়া সমবায় আন্দোলনের কোনো বিকল্প নেই। এছাড়া সঞ্চয়ের মনোভাব, আমানত সংগ্রহ এবং কর্মক্ষেত্র বৃদ্ধির প্রবণতা তৈরিতে তরুণ জনগোষ্ঠীর মাঝে সমবায়ের ধারণার ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে। আমানত সংগ্রহ করে উৎপাদন খাতের প্রসারে সমবায়ের ভূমিকা অনন্য।

বর্তমানে বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড পিরিয়ডে অবস্থান করছে। ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড হচ্ছে ১৫-৬৪ বছর বয়স পর্যন্ত কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা। এই কর্মক্ষম জনসংখ্যা একটি দেশে সর্বোচ্চ ২০-৩০ বছর স্থায়ী হয়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশে বেকারের সংখ্যা ৩ কোটি। প্রতিষ্ঠানটি আভাস দিয়েছে, কয়েক বছরে তা দ্বিগুণ হয়ে ৬ কোটিতে দাঁড়াবে, যা মোট জনসংখ্যার ৩৯ দশমিক ৪০ শতাংশ হবে। উক্ত বেকার জনসংখ্যার একটা বড় অংশ হলো যুবক। এই যুব শ্রেণিকে সমবায়ের মাধ্যমে একত্র করে পুঁজি গঠন করে উৎপাদন খাতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে বাংলাদেশ, ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড এর পূর্ণ সুবিধা উপভোগ করতে পারতো এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে পৌঁছাতে যে অভিলক্ষ্য রয়েছে তা সহজে অর্জন করা সম্ভব হতো। এই অভিলক্ষ্যকে সামনে রেখে তরুণ জনগোষ্ঠীকে সমবায়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে বঙ্গবন্ধুর ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চের ভাষণ আমরা স্মরণ করতে পারি। তিনি বলেছিলেন, "আমার যুবক ভাইরা, আমি যে কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি

গ্রামে গ্রামে, এর ওপর বাংলার মানুষের বাঁচা নির্ভর করবে। আপনাদের ফুলপ্যান্টটা একটু হাফপ্যান্ট করতে হবে। পাজামা ছেড়ে একটু লুঙ্গি পরতে হবে। আর গ্রামে গ্রামে যেয়ে এই কো-অপারেটিভকে সাকসেসফুল করার জন্য কাজ করতে হবে। যুবক চাই, ছাত্র চাই, সকলকে চাই।"

কর্মক্ষম তরুণ জনগোষ্ঠীকে উৎপাদন খাতে মনোনিবেশ করতে এবং বঙ্গবন্ধু কর্তৃক গ্রামাঞ্চলে বাধ্যতামূলক উৎপাদনমুখী সমবায় নীতি বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২ নভেম্বর, ২০১৯ সমবায় দিবসে বলেছেন, "সমবায়ের সদস্যবৃন্দ যেসব পণ্য উৎপাদন করছে সেগুলো শিল্প-কারখানার কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে যদি প্রক্রিয়াজাতকরণ করতে পারে, তাহলে গ্রামবাংলা আর অবহেলিত থাকবে না। দেশের কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে সমবায়ের যোগসূত্র স্থাপন করা গেলে কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত হবে। চাষোপযোগী কোনো জমি অনাবাদি থাকবে না। দেশের উন্নয়নে যুবশক্তিকে কাজে লাগিয়ে মাটি, জল, বায়ু ও পরিবেশের সমন্বয়ে সমবায়ভিত্তিক উদ্যোগের কোনো বিকল্প নেই। সমবায়ের মূল চেতনা হলো সম্মিলিত উদ্যোগ। একার পক্ষে যে কাজ করা সম্ভব নয় তা সম্মিলিত উদ্যোগে সহজে করা যায়।"

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান থেকে শুরু করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও উপলব্ধি করতে পেরেছেন, টেকসই উন্নয়নের একমাত্র হাতিয়ার হলো "সমবায়"। যদি টেকসই উন্নয়নের দিকে লক্ষ করা হয় তবে দেখা যায় যে, টেকসই উন্নয়নের ৮নং অভীষ্ট হচ্ছে "সবার জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান, শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন"। যুবশ্রেণিকে কাজে লাগিয়ে সমবায়ের মাধ্যমেই এ অভীষ্ট দক্ষতার সঙ্গে অর্জন করা সম্ভব। উপরন্তু এ অভীষ্টের সঙ্গে ১নং অভীষ্ট "সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান", ২নং অভীষ্ট "ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার", ৫নং অভীষ্ট "জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সব নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন", ১০নং অভীষ্ট "আন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা", ১২নং অভীষ্ট "পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন ধরন নিশ্চিত করা" ইত্যাদির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ততা রয়েছে। সুতরাং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করতে হলে তরুণ জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে সমবায়কে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা অতীব জরুরি। এজন্য কর্মক্ষম যুবশ্রেণির মাধ্যমে প্রকৃত সমবায়ী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

দেশের প্রায় সব পেশার মানুষের সমিতি বা সংঘ রয়েছে। অথচ কৃষকদের মধ্যে সংঘ বা সমিতি চেতনা এখনও খুবই কম। সমবায় খামার গড়ে তোলার প্রবণতা ও মানসিকতার অভাবে কৃষির অধিকতর আধুনিকায়ন ও যান্ত্রিকীকরণের কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং তরুণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে পুঁজি গঠন বা পুঁজি সরবরাহ করে সমবায়ের মাধ্যমে কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে যান্ত্রিকীকরণের কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া যেতে পারে। সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদন বেশি করলে তা দেশীয় চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সাহায্য করবে।

গ্রাম ভিত্তিক যুব সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে কোনো জমি পতিত বা অনাবাদি না রেখে অনিবাসি ও অনুপস্থিত জমির মালিকদের কৃষি উপযোগী জমি, সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে চাষের আওতায় এনে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজারজাতকরণে উদ্বুদ্ধ করা এবং সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য হতে অর্জিত লভ্যাংশ জমির মালিক, কৃষি শ্রমিক ও সমবায়ের মধ্যে যৌক্তিক হারে বিভাজনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থ সংরক্ষণ করা সম্ভব। উক্ত ব্যবস্থাপনায় সমবায় সমিতিকে নিয়ে যেতে পারলে দারিদ্র্য কমার পাশাপাশি সমাজে শ্রেণি বৈষম্য হ্রাস পাবে এবং উৎপাদন ব্যবস্থার সুসম বণ্টন নিশ্চিত হবে।

বর্তমানে অতিসক্রিয় সমবায় সমিতিগুলো লক্ষ করলে দেখা যায় যে, বেশির ভাগ অতিসক্রিয় সমবায় সমিতি উনিশ শতকের ষাট ও সত্তর দশকে গঠিত। সমবায় সমিতিসমূহের বর্তমানে যে সকল সদস্য জীবিত রয়েছে, তৎকালীন সময়ে তাদের সকলেই তরুণ ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, কাজী নাজমুস সাদত, যিনি ১৯৭৪ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে ১৭ টাকা দিয়ে "পয়ালগাছা উত্তর ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ" সদস্য হন। বর্তমানে তিনি "কুমিল্লা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ" এর সভাপতি। তাঁর নেতৃত্বে ব্যাংকটি প্রায় প্রতিবছর কোটি টাকার উপর নিট প্রফিট অর্জন করেছে। এছাড়াও কুমিল্লা সমবায়ের নেতৃবৃন্দের মধ্যে অন্যতম আলহাজ্ব মোঃ সিরাজুল হক, তাঁরা ড. আখতার হামিদ খানের হাতে গড়া কুমিল্লা সমবায়ের আলোকবর্তিকাকে যুব বয়স থেকে আজ পর্যন্ত তুলে ধরে রেখেছেন। সুতরাং এটি পরীক্ষিত যে, দক্ষ যুব চেতনায় সমবায়কে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব। তাই তরুণদের মাঝে সমবায়ের ধারণাকে সহজে উপস্থাপন করতে সমবায়ের প্রচার অত্যন্ত জরুরি, যা সমবায়কে সর্ব শ্রেণির মাঝে জনপ্রিয় করে তুলবে।

দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী একটি সুসম বণ্টনের স্বীকৃত মাধ্যম হচ্ছে সমবায়। "বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন" স্লোগানকে সামনে রেখে বর্তমানে অর্থনীতির প্রায় সব শাখায় সমবায় তার কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে। সরকারের নির্বাচনি অঙ্গীকার ও ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়নে তরুণদের সমন্বয়ে সমবায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, বিশেষ করে আর্থিক ও সেবা খাতে নতুন কার্যক্রম গ্রহণ, বিদ্যমান কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন ও সময়োপযোগীকরণের মাধ্যমে সমবায় অধিদপ্তর বেশ কিছু মৌলিক লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখতে পারে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন, প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন বিশেষত নারী উন্নয়নে সমবায় নিকট ভবিষ্যতে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। পৃথিবীতে অনেক উন্নত রাষ্ট্রই সমবায়ের কৌশলকে অবলম্বন করে স্বাবলম্বী হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে তরুণ নেতৃত্বের মাধ্যমে সমবায় চেতনায় মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে যেকোনো কঠিনতর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বাংলাদেশকে সম্ভাবনাময় কাঙ্ক্ষিত সোনার বাংলা উপহার দিয়ে বিশ্ব দরবারে সুনাম ও সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

মোঃ আল-আমিন: জেলা সমবায় অফিসার, কুমিল্লা।

Delegates from Nepal Department of Cooperative and NEFSCUN.

নেপালে সমবায়ের চিত্র

এম. এম. মোর্শেদ

নেপালে তুলনামূলকভাবে সমবায়ের ইতিহাস খুব একটা প্রাচীন নয়। ১৯৫৭ সালের ২ এপ্রিল 'বাগমতি ক্রেডিট কো-অপারেটিভ কমিটি' নামে একটি ঋণ বা আর্থিক সমবায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নেপালে সমবায় আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে নেপালের সমবায়গুলো ছিল রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এবং নিয়ন্ত্রিত। সেখানে সমবায়ের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন ছিল না। ১৯৬০-এর দশকে সমবায়গুলো তাদের অগণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা পূরণে সরকারের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতো। সমাজের অভিজাত শ্রেণি ও প্রশাসনের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের স্বার্থ রক্ষা করাই ছিল সমবায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। নেপালে প্রথম সমবায় আইন প্রণীত হয় ১৯৬০ সালে। ১৯৮০-এর দশকে নেপালে বিপুল সংখ্যক সম্প্রদায় ভিত্তিক সঞ্চয় ঋণ সমবায় গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে জনগণের ব্যাপক বিক্ষোভের পর নেপাল ১৯৯০ সালে তার রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফিরে পায় এবং নেপালে সমবায় খাতসহ প্রতিটি সেক্টরের দৃশ্যপট পরিবর্তিত হয়। ১৯৯২ সালে নেপালে নতুন সমবায় আইন জারি করা হয়, ফলশ্রুতিতে নেপালে, একাধিক সম্ভাবনার পথ খুলে যায়। সমবায়কে জাতীয় অর্থনীতির চালিকা শক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ১৯৯০-এর দশকে উদারীকরণ ও মুক্তবাজার অর্থনীতি নেপালে সমবায় উন্নয়নের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। ২০১৫ সালে নেপালের সংবিধান সমবায়কে জাতীয় অর্থনীতির তিনটি স্তম্ভের একটি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ২০১৭ সালের ১৮ আক্টোবর সমবায় আইন এবং ২৪ এপ্রিল ২০১৯ সালে সমবায় প্রবিধান কার্যকর হওয়ার ফলে নেপালের সমবায় আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

নেপালের সমবায় নিয়ন্ত্রক সংস্থা সমবায় অধিদপ্তর (Department of Co-operative) স্থাপিত হয় ১৯৫৩ সালে। তখন সমবায় অধিদপ্তরটি ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল। বর্তমানে সমবায় অধিদপ্তরটি ভূমি ব্যবস্থাপনা, সমবায় ও দারিদ্র্য বিমোচন মন্ত্রণালয়ের অধিনে ন্যস্ত। সমবায় অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার পদবি নিবন্ধক। বর্তমান সমবায় নিবন্ধক জনাব Rudra Prasad Pandit। নেপালে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে, নেপালে ২৯,৮৮৫টি সমবায় রয়েছে যার ৭ মিলিয়ন সদস্য রয়েছে। নেপালের সমবায়ের অর্ধেকেরও বেশি নারী সদস্য। নেপালে সমবায়ের মাধ্যমে প্রায় ৯ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। নেপালের মোট জিডিপি এর ৪% অবদান রাখছে সমবায়। সমবায়গুলো মূলত ক্ষুদ্র কৃষক, কামার কুমার, শ্রমিক, ভোক্তা, ঋণ ও অন্যান্য দরিদ্র শ্রেণির পেশাজীবী। তবে নেপালি সমবায় আর্থিক বা ঋণ সমবায় দ্বারা প্রভাবিত। সমবায়ের একটি বড় অংশ সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবসায় নিয়োজিত। নেপালে মোট ১৪ লক্ষ সমবায় রয়েছে। সরকারি সংস্থার সাম্প্রতিক তথ্যমতে নেপালের মোট জনসংখার ১/৪ অংশ (প্রায় ৩০ মিলিয়ন) সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত। নেপালে সমবায় হাজার হাজার মানুষের দুঃখকে পরাজিত করে হাসি এনেছে। সমবায় সংস্কৃতি নেপালি সম্পদায়ের প্রাণ। নেপালের শীর্ষ সমবায় সংস্থা হচ্ছে ন্যশনাল কো-অপারেটিভ ফেডারেশন (NCF)।

NCF স্থাপিত হয়েছিল ২০ জুন ১৯৯৩ সালের সমবায় আইন-১৯৯২ অনুযায়ী। NCF নেপালে সকল স্তরের সার্বজনীন সমবায় নীতিমালা অনুযায়ী গঠিত হয়েছিল। আনুমানিক ২ মিলিয়ন

বিভিন্ন সমবায় সদস্য এই প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। NCF নেপালের সমগ্র সমবায় আন্দোলনের অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক। NCF ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক সমবায় সংস্থা (ICA) এর সদস্য পদ লাভ করে। NCF এর বর্তমান মূলধন ৫০০মিলিয়ন নেপালি রুপি। জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত এসডিজি বাস্তবায়নে NCF এবং UNDP যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সমবায় আন্দোলনকে আরো অধিক জোরদার করার জন্য বিশেষ করে এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উভয় সংগঠনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি স্বাক্ষরতার মধ্য দিয়ে NCF সমগ্র নেপালের সকল প্রকার সমবায় কার্যক্রমকে বিশেষ করে এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। নেপালের আর্থসামাজিক উন্নয়নের ও এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমবায় একটি অন্যতম সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইতোমধ্যে সমবায় একাত্মতা ঘোষণা করেছে। NCF-এর চেয়ারপার্সন Keshav Prasad Badal বলেন, 'We are committed to develop comprehensive SDG implementation Guidelines and continuously build capacity of the Co-operative at all levels So that they could align their activities to have a more direct and concrete contribution to the achievement of the global goals.'

নেপালে এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারি, বেসরকারি ও সিভিল সোসাইটি সমবায়ের মাধ্যমে একযোগে কাজ করার জন্য NCF এবং UNDP বদ্ধপরিকর। উল্লেখ্য যে NCF পরিচালিত নেপালের ৭টি প্রদেশের সকল সমবায়কে তাদের ভালো কাজের (Decent Work) অবদানের জন্য 'Excellent Co-operative Award' এবং 'Excellent Co-operative Business Award' প্রদান করা হয়। নেপালের UNDP আবাসিক প্রতিনিধি Ayshanie Medagangoda Labe বলেন যে বিভিন্ন স্তরের ৫০০-এর অধিক সমবায়ের সঙ্গে তারা একসাথে কাজ করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এই কাজ করার জন্য সদাপ্রস্তুত। NCF-এর ভাইস চেয়ারপার্সন ও আন্তর্জাতিক সমবায় সংস্থার বোর্ড মেম্বর Om Devi Malla কে নেপালে সমবায় আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য নেপালের মহামন্য রাষ্ট্রপতি Bidhya Devi Bhandari তাকে রাষ্ট্রীয় সম্মাননা (Su Paraball Janosewa Shree Binhusan) প্রদান করেন।

নেপাল দক্ষিণ এশীয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় এবং বিশ্বের অন্যান্য সহযোগী বন্ধুত্বপূর্ণ দেশগুলোর সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখে। তাছাড়া দক্ষিণ কোরিয়ার NACUFOK নেপালি সমবায় এর সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আর্থিক সমবায়ের কেন্দ্রীয় ফেডারেশন বা সেভিংস অ্যান্ড ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি (SACCOS)। নেপাল ফেডারেশন অফ সেভিংস অ্যান্ড ক্রেডিট কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন লিমিটেড (NEFSCUN) স্থাপিত হয়েছিল ১৬ আগস্ট ১৯৮৮ সালে। NEFSCUN নেপালে বিভিন্ন বিষয়ের সমবায়ের অন্যান্য ১৮টি কেন্দ্রীয় ফেডারেশনের মধ্যে প্রাচীনতম এবং পরিসংখ্যানগতভাবে সবচেয়ে শক্তিশালী। এটি এককভাবে প্রায় ২০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সংগ্রহ করে যেখানে এর নেটওয়ার্ক সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৩.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা প্রভাবশালী Ripple effects-এর মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখে। NEFSCUN ওয়ার্ল্ড কাউন্সিল অফ ক্রেডিট ইউনিয়ন এবং অ্যাসোসিয়েশন অফ এশিয়ান কনফেডারেশন অফ ক্রেডিট ইউনিয়নের একজন গর্বিত এবং সক্রিয় সদস্য। NEFSCUN প্রতিষ্ঠার পর থেকে এটি সমবায় এবং ক্রেডিট ইউনিয়ন নীতিতে বিশ্বব্যাপী সম্মত সদস্যদের শক্তিশালী করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

১৭ জুলাই ২০২২ সালে নেপালের সমবায় অধিদপ্তরের উপনিবন্ধক (তথ্য কর্মকর্তা) Tola Raj Upadhyaya এবং NEFSCUN এর জেনারেল সেক্রেটারি Damodar Adhikar ও সিনিয়র অফিসার Navin Raj Dahal

> নেপালে ২৯,৮৮৫টি সমবায় রয়েছে যার ৭ মিলিয়ন সদস্য রয়েছে। নেপালের সমবায়ের অর্ধেকের ও বেশি নারী সদস্য। নেপালে সমবায়ের মাধ্যমে প্রায় ৯ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। নেপালের মোট জিডিপি এর ৪% অবদান রাখছে সমবায়। সমবায়গুলো মূলত ক্ষুদ্র কৃষক, কামার কুমার, শ্রমিক, ভোক্তা, ঋণ ও অন্যান্য দরিদ্র শ্রেণির পেশাজীবী।

বাংলাদেশের সমবায় সম্পর্কে জানার জন্য বাংলাদেশে সফরে আসেন। নেপালের সমবায় অধিদপ্তরের ও NEFSCUN-এর প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের সমবায় অধিদপ্তরের অতিরিক্ত নিবন্ধক (প্রশাসন) মোঃ আহসান কবীরসহ অধিদপ্তরের উচ্চ কর্মকর্তাদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। বেকারত্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সদস্যদের আয় তৈরির দক্ষতা বাড়াতে সরকার বারবার সমবায়কে আহ্বান জানিয়ে আসছে। সমবায় সবসময় ভূমিকম্প, ভূমিধস, বন্যা, অগ্নিকান্ড এবং এর প্রভাবের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে লড়াই করে আসছে।

নেপালে সমবায় আন্দোলনের অন্তরায়সমূহ

সরকারি তহবিলের অপব্যবহার, আত্মসাৎ, কিছু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বা পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের উদ্দেশ্যে তহবিল ব্যবহার করা ইত্যাদি সমবায়ে পাওয়া যায়। ফলে সমবায়ের প্রতি জনগণের আস্থা ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এছাড়া অনুৎপাদনশীল খাতে বেশ কয়েকটি সমবায়ের বিনিয়োগের উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে। সেবা ও লক্ষ্যভিত্তিক হওয়ার পরিবর্তে,

Board members and management of NEFSCUN & NCF during NEFSCUN Foundation Day (16 August 2022).

নেপালের বেশিরভাগ সমবায় মুনাফামুখী হয়ে উঠেছে। রেগুলেটরি ও মনিটরিং আরেকটি উদ্বেগের বিষয়-কেননা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সঠিক যাচাইবাছাই ছাড়াই সমবায় সমিতি নিবন্ধিত ও নিরীক্ষিত হচ্ছে। রাজনৈতিক প্রভাব, পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপ্রীতির প্রভাব এ খাতে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। তাছাড়া নেপালি সমবায়ে তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণ অনুপস্থিত।

NEFSCUN-এর প্রোগ্রাম অফিসার Ranjan Mani Paudyal-এর প্রদত্ত সুপারিশসমূহ হতে পারে নেপালের সমবায় আন্দোলনের দিক নির্দেশনা :

১. আইনি বাধাগুলো সহজ করার জন্য শক্তিশালী অ্যাডভোকেসি এবং অবিরাম লবিং এবং কাজের পদ্ধতি এবং আমলাতন্ত্রের মানসিকতায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা।

২. রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং সমবায়ের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় স্থাপন করা।

৩. ডিজিটাল গণতন্ত্র নিশ্চিত করুন।

৪. সদস্যরা সমবায়ে তাদের দুটি একচেটিয়া অধিকার ব্যবহার নিশ্চিত করুন- ক. ভোটাধিকার। খ. ভয়েসিং অধিকার।

৫. পুনর্গঠিত, পুনঃডিজাইন করা, পুনর্নির্মাণ করা, সদস্য শিক্ষা যা সদস্যদের এবং সম্ভাব্য সদস্যদের উভয়ের চাহিদা এবং সংস্থার চাহিদাগুলোকে উদ্বুদ্ধ করে।

নেপালে সমবায়ের ইতিহাস ছয় দশকেরও বেশি পুরনো হলেও এ খাতে পেশাদার ও দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে। সমবায়ের উচিত নিম্ন আয়ের পেশাজীবীদের জন্য কাজ করা এবং একই সাথে বিনিয়োগকারীদের লক্ষ রাখা উচিত জাতির অগ্রগতির জন্য অবদান রাখা।

সমবায়ে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, যুবসমাজকে সমবায়ের সাথে সম্পৃক্তকরণ, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং সমবায় সমিতি নিবন্ধন ও নিরীক্ষায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণ নেপালের সমবায় আন্দোলনকে আরো গতিশীল করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমরা বাংলাদেশের সমবায়ের মধ্যে নেপালের সাফ্যলের দৃষ্টান্তগুলোকে, বিশেষ করে নেপালের মতো UNDP-এর সাথে আমাদের সমবায়কে সম্পৃক্ত করে এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চুক্তি স্বাক্ষর করা যেতে পারে। আমাদের সমবায়গুলোকে সার্ক দেশের সমবায়ের সাথে এবং আন্তর্জাতিক সমবায় সংস্থা/এশিয়া প্যাসিফিক আঞ্চলিক সমবায় সংস্থার সাথে আরো গভীর সমন্বয় সাধন করা যেতে পারে।

Acknowledged & gratitude to Mr. Ranjan Mani Paudyal, Program Officer NEFSCUN, Nepal for his excellent cooperation.

Reference

1. The cooperative Landscape of Nepal- Ranjan Mani Paudyal
2. Annual Report-2021, NEFSCUN
3. ICA-AP Newsletter, June 2019
4. ICA-AP Newsletter, July 2019
5. http:/www.ncfnepal.com.np

এম. এম. মোর্শেদ : সিনিয়র ম্যানেজার, কমপ্লায়েন্স, ইন্টারটেক বাংলাদেশ, (সাবেক কোয়ালিটি, এথিক্স অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট কো-অর্ডিনেটর, ইন্টারকুপ (Intercoop) বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান)।

সমবায়ে সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা

শারমিন আক্তার

“দশের লাঠি, একের বোঝা”; “দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ”; “দশ জনে দশ কিল, একজনের মুশকিল”-প্রবাদগুলোর সাথে আমরা কম-বেশি সবাই পরিচিত যার মূল কথা হলো একা নয় সম্মিলিতভাবে কোনো অসাধ্য সাধন করা অর্থাৎ সমবায়ের ভিত্তিতে কোনো কাজ সম্পন্ন করা।

নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যখন একই শ্রেণি পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত সমমনা বা একই মানসিকতা সম্পন্ন কিছু সংখ্যক মানুষ একত্রিত হয়ে কোনো সংগঠন বা সংস্থা গঠন করে, তখন ঐ সংস্থাকে সমবায় বলে। আর সমবায় সমিতি হলো গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে সদস্যরা তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে থাকে। জনবল, অর্থবল ও মনোবল-এই তিনটি শক্তির সমষ্টি হলো সমবায়। যেখানে ধনী, গরিব, মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতি, শ্রমিক, মালিক, শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত সবাই এক হয়ে তাদের কষ্টার্জিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজি দ্বারা গঠিত মূলধন বিভিন্ন কর্মমুখী/উৎপাদনমুখী/উন্নয়নমূলক খাতে বিনিয়োগ তথা বহুমাত্রিক বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজেদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে থাকতে হবে সততা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা তবেই আসবে সফলতা।

বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের দেশ। নভেম্বর ২০২০ বিশেষ সংখ্যা মতে সারাদেশে সমবায় সমিতিসমূহের মোট সম্পদের পরিমাণ ৬,৩৫৪ কোটি টাকা এবং ১৪,৪৯২.১৪ কোটি টাকা সমবায়ীদের কার্যকরী মূলধন থাকা সত্ত্বেও সঠিক খাত নির্বাচন করে

বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালিত না হওয়ায় সমবায় খাতে রাষ্ট্রের অন্য দুটি মালিকানা খাতের মতো দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে আশানুরূপ ভূমিকা পালন করতে পারছে না। উল্লেখ্য, সংবিধানের ১৯(২) অনুচ্ছেদে সমবায় মালিকানাকে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মালিকানা খাত হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

সাড়ে ষোলো কোটি মানুষের এই বাংলাদেশে সকলের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা সরকারের একার পক্ষে অসম্ভব অথচ সঠিক সমবায় ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া যেতে পারে।

১৯৭৪ সালে ২৫ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন-"সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়ে তুলতে হলে দেশবাসীকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে হবে কিন্তু একটি কথা ভুলে গেলে চলবে না- চরিত্রের পরিবর্তন না হলে এই অভাগা দেশে ভাগ্য ফেরানো যাবে কি না সন্দেহ। স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও আত্ম প্রবঞ্চনার উর্ধ্বে থেকে আমাদের সকলকে আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি করতে হবে"।

বঙ্গবন্ধুর আহ্বান ছিল দারিদ্র্যমুক্ত ও শোষণমুক্ত সোনার বাংলা নির্মাণ করার। বঙ্গবন্ধুর সেই আদর্শে সোনার বাংলা নির্মাণ করতে তারাগঞ্জ উপজেলার আলমপুর গ্রামে ১৯৪৮ সালের ১৭ই মার্চ গঠন করা হয় আলমপুর ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ যার নিবন্ধন নং-০৪। সমিতির বর্তমান সভাপতি জনাব আব্দুর রশিদ চৌধুরী ছাত্রজীবন থেকে সরাসরি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কাজ করেছেন, বুকে লালিত করেছেন তাঁর স্বপ্ন। চেষ্টা করেছিলেন তাঁর আদর্শে আদর্শিত হয়ে আলমপুর ইউনিয়ন বিনির্মাণের। জন্মলগ্ন হতে সমিতিটির খুব জৌলুস ছিল। বয়সের ভারে তাঁর নিজের ন্যায় সমিতিটিরও মুখ থুবড়ে পড়ে। বর্তমানে তিনি সমিতিটিকে চাঙা করতে চান। লাঠি ছাড়া সোজা হয়ে দাঁড়াতে চান সমিতিটিকে নিয়ে। উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের পাশাপাশি সমিতির অন্য সকল সদস্যকে নিয়ে আরও উদ্যমী হতে তাঁকে অনুপ্রেরিত করেন বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ি, কুমিল্লার সুযোগ্য অধ্যক্ষ জনাব হরিদাস ঠাকুর স্যার। গত ০৭ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখ সন্ধ্যা ৭.২৫ হতে রাত ৮টা উত্তরবঙ্গের সেই হাড় কাপানো শীতে অধ্যক্ষ মহোদয়ের উপস্থিতি ছিল কম্বলে জড়ানো উষ্ণ আলিঙ্গান। উপস্থিত সকল সদস্যগণ নতুন প্রত্যয় নিয়ে আগামী দিনের পথ চলা শুরু করবেন মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

১৯৭০ সালে সৈয়দপুর হাইস্কুল মাঠে নির্বাচনি পথসভায় বঙ্গবন্ধুর পাশে রয়েছেন তৎকালীন সংসদ সদস্য ডা. জিকরুল হক এবং আলমপুর ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর বর্তমান সভাপতি জনাব আব্দুর রশিদ চৌধুরী। উক্ত সভায় বঙ্গবন্ধু বলেন- "আমি সমবায়কে গণমুখী করতে চাই"।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ছেলেকে সুদূর আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন কৃষিবিদ্যা শেখার জন্য। তাঁর স্বপ্ন ছিল তাঁর গ্রামগুলোতে আধুনিক কৃষিবিদ্যার প্রচলন এবং ট্রাক্টর দিয়ে সমবায়ভিত্তিক চাষাবাদের ব্যবস্থা করবেন। এ প্রযুক্তি প্রয়োগের পূর্বশর্ত হলো বৃহদায়তন খামার। তখন এই খামার দুইভাবে প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতো- ব্যক্তিমালিকানা উচ্ছেদ করে রাষ্ট্রীয় মালিকানার মাধ্যমে অথবা মালিক চাষিদের স্বেচ্ছাভিত্তিক সমবায়ের মাধ্যমে। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। সমবায়ের মাধ্যমে যদি সমন্বিত কৃষিভিত্তিক চাষাবাদ (বিশেষ করে ফসলের জমিতে জিওল মাছ চাষ, পুকুরে মাছ চাষের পাশাপাশি পুকুর পাড়ে কম পাতা ঝড়ে এমন গাছ লাগানো, হাঁস-মুরগি পালন, পাখি পালন, মাচা ব্যবহার করে লতানো গাছ লাগানো ইত্যাদি) করে দেশের অর্থনীতিতে সমবায় বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

উইলিয়াম আর্থার ওয়ার্ড-এর মতে- "একজন সাধারণ শিক্ষক বক্তৃতা করেন। একজন ভালো শিক্ষক বিশ্লেষণ করেন। একজন উত্তম শিক্ষক প্রদর্শন করেন। একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক অনুপ্রাণিত করেন।" সমবায় বিভাগে কর্মরত আমরা সকলেই শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের ভূমিকা পালন করতে পারি।

ইতিপূর্বে নিবন্ধিত যে সকল সমবায় সমিতি শুধুমাত্র ঋণ কার্যক্রম করে থাকে তাদেরকে ঋণ কার্যক্রম হতে বের করে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক/উৎপাদনমুখী/কর্মমুখী কাজে অনুপ্রাণিত করতে পারি। কেননা, মহাজনি কারবারের বিরুদ্ধেই সমবায়ের জন্ম। এক্ষেত্রে, আন্তঃসমবায় সম্পর্ক সমবায়ীদেরকে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নে অগ্রণি ভূমিকা পালন করতে পারে।

অপরদিকে, যত্রতত্র সমবায় সমিতি নিবন্ধন না দিয়ে নিবন্ধনের পূর্বে আরও অধিকতর যাচাইবাছাইপূর্বক সমবায় সমিতি নিবন্ধন প্রদান করা যেতে পারে। কথায় আছে-"মানিকের খানিক ভালো"। অতএব, নামমাত্র হাজার হাজার সমবায় সমিতির পরিবর্তে হাতে গোনা কিছু সমিতি হবে যার কিছু অংশ হবে আন্তর্জাতিক মানের। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, সমগ্র সিঙ্গাপুর জুড়ে রয়েছে মাত্র ৩টি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি যার একটি সমিতির ২২ তলাবিশিষ্ট ভবন রয়েছে। অথচ আমাদের একটি পাড়াতেই হয়তো তার অধিকসংখ্যক মৎস্যজীবী অথবা অন্য কোনো একই ধরনের/একাধিক ধরনের সমবায় সমিতি পাওয়া যেতে পারে।

আবার, কিছু উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতি কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন করলেও তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের কোনো ব্যবস্থা নেই। বাধ্য হয়ে তারা স্থানীয় বাজরে কমমূল্যে বাজারজাত করে থাকে যার আশু সমাধান প্রয়োজন। আমার দৃষ্টিতে আন্তঃসমবায় সম্পর্কের মাধ্যমে প্রতি ইউনিয়নে একটি সমবায় মার্কেট থাকবে যেখানে ঐ এলাকার সকল ধরনের সমবায় সমিতি তাদের উৎপাদিত নির্ভেজাল পণ্য বাজারজাত করবে। সমবায়ীরা পাবে তাদের ন্যায্যমূল্য আর সাধারণ জনগণ সরাসরি নির্ভেজাল পণ্য পাবে। থাকবে শুধু উৎপাদক ও ভোক্তা। কোনো মধ্যস্বত্বভোগী থাকবে না। অদূর ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে তাদের উৎপাদিত পণ্য ইউনিয়ন থেকে উপজেলা, উপজেলা থেকে জেলা, জেলা থেকে বিভাগ, বিভাগ থেকে সারাদেশ এমনকি সারা পৃথিবীব্যাপী বাজারজাত করতে পারবে-এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

পরিশেষে, "সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"-এই মর্মবাণী ধারণ করে সমবায় আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের একান্ত দায়িত্ব।

শারমিন আক্তার: উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, তারাগঞ্জ, রংপুর।

সমবায় শৃঙ্খলাসহ উন্নতির ধারক ও বাহক

মো. আব্দুল বাকী চৌধুরী নবাব

বর্তমান ন্যানো ও গড পার্টিকেলের যুগে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমবায় যে কতখানি জায়গা জুড়ে আছে; তা চিন্তার বাইরে। কেননা এই অত্যাধুনিক যুগে সমবায় ব্যতিরেকে এ পর্যায়ে আসা যেত কি না, সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আর সমবায় সমবেত জন-মানুষের প্রতিফল হলেও এক্ষেত্রে ত্যাগের ক্রিয়াশীল ভূমিকা অনস্বীকার্য। এদিকে সমাজ পরিবর্তনশীল; এটি এক জায়গায় থাকে না। বস্তুত, এ বিশ্বে সবকিছুই চির চঞ্চলেরই ধারাবাহিকতায় স্বভাবতই যে বিষয় ওঠে আসে, তা হলো সমাজ স্থির নয়, ঠিক বহতা নদীর মতো। আর এক্ষেত্রে গ্রিক দার্শনিক হেরাক্লিটাসের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। কেননা তিনি বলেছিলেন যে "একজন মানুষের পক্ষে একই নদীতে দু'বার গোসল করা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে যদি তলিয়ে দেখি, তাহলে এই দাঁড়ায় যে সময়ের সাথে সাথে নদীটি তার পূর্ববর্তী অবস্থায় রয় না এবং একই সঙ্গে গোসলকৃত মানুষটিও মনোদৈহিক দিক দিয়ে আগের সেই অবস্থায় থাকে না। আর কথাগুলো এই কারণে বললাম যে, সময় ও অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে শৃঙ্খলাকে সামনে রেখে তাল মিলিয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়। তাই জটিল মানসিকতার মনুষ্য জীবের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। কেননা মানুষ একই ধারাবাহিকতায় চলে না। অবশ্য সমবায়ী দার্শনিক নিয়ামকের সুবাদে নানামুখী মানুষকে একই ছত্রতলে আনা অনেকাংশে সম্ভব হয়ে থাকে। নতুবা পরিবর্তনের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক একই পয়েন্টে সমবেত করা দুরূহ হয়ে দাঁড়াতো। যাহোক, এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয়ক্ষেত্রে সমবায়ের বিষয় নিয়ে আলোচনায় ব্রতী হয়েছি। আরেকটি কথা হলো যে, সত্যিকার সমবায় সমিতি আনুষ্ঠানিক ও সমান্তরাল বৈশিষ্ট্য নিয়ে চলমান। কিন্তু সুপ্ত সমবায়ী কার্যক্রম অনানুষ্ঠানিক এবং সমান্তরাল ও উল্লম্ব উভয় বৈশিষ্ট্যের আদলে সূক্ষ্মভাবে চলে থাকে।

এটি সত্য যে, গঠনমূলক কাজ বা উন্নয়ন সারণির অন্যতম প্রধান উপাদান হলো শৃঙ্খলা। এদিকে শৃঙ্খলা মতে চলতে গেলে সহযোগী সদস্যদের আন্তরিকতা ও সহযোগিতা একান্ত অপরিহার্য। আর এ বিষয়টি লক্ষ করা যায় প্রকৃতির অতি ক্ষুদ্র প্রাণী পিঁপড়া ও মৌমাছির মধ্যে। এই প্রাণীগুলো এতটাই কাজের প্রতি অনুরাগী ও আন্তরিক যে শৃঙ্খলার সারীধি ধরে কর্ম সম্পাদন করতে এতটুকু সময় নষ্ট করে না। যদি পিঁপড়ার কথায় আসি, তাহলে দেখা যায় যে, এ প্রাণী নাকি কাজকে গুরুত্ব দিয়ে জীবনে কখনও ঘুমায় না। এরা সমবায়ী মনোভাব নিয়ে রাত দিন চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করে থাকে। মূলত বিভিন্ন আঙ্গিকে কর্মই উন্নতির শিখরে পৌঁছিয়ে দেয়। এ প্রেক্ষাপটে একটি বচনের কথা স্মরণে আসে, যা হলো:

"সমবায়ী সুশৃঙ্খল কাজ কর্মে ব্যস্ততা,
বয়ে আনে উত্তরোত্তর উন্নতি ও সুস্থতা।"

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, মানুষ কখনও একা চলতে পারে না। তাই আদিমযুগে টোটেম গ্রুপের আওতায় সমাজবদ্ধতা তথা সামাজিকীকরণের সূত্র ধরে এগিয়ে চলে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছিয়েছে। একবার অনুগ্রহপূর্বক ভাবুন তো? এর পেছনে এমন কোনো, আলাদিনের আশ্চার্য প্রদীপ রয়েছে? আসলে সেই প্রদীপ আর কিছু নয়। সেটা হলো কাম্য সমবায় প্রপঞ্চ। আজ যে বিশ্বব্রহ্মান্ড সৃষ্টির আদি রহস্য উদ্ঘাটন এবং জিনোম সিক্যুয়েন্স আবিষ্কৃত হয়েছে। সেটি সম্ভব হয়েছে কেবল রিলে রেসের সূত্র ধরে সমবায়ী অর্ভুতপূর্ব পৌনঃপুনিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে। এখন প্রশ্ন করতে পারেন যে, এগুলো কি করে সমবায়ী কার্যক্রম হতে পারে? হ্যাঁ, এই মহতী কার্যক্রম অবশ্যই সূক্ষ্ম সমবায়ী নিয়ামকের প্রতিফল এবং যা গ্লোবাল ভিলেজ হিসেবে সামষ্টিক মিথস্ক্রিয়ামূলক উন্নতির ধারক ও বাহক বই কিছু নয়। এটি সর্বজনস্বীকৃত যে সমাজে চলার জন্য আবশ্যক একতা ও পারস্পরিক সহযোগিতা এদিকে মনুষ্যজীব র‍্যাশনাল হলেও একে অপরের মুখাপেক্ষী এবং নির্ভরশীল। আর ধনী ও গরিব মিলেই তো সমাজ। এটি স্বীকৃত যে, বিভিন্ন জনপদের প্রকৃতি, নানা ভাষাভাষি, কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ধর্মাবলম্বীদের সমন্বয়ে একটি দেশ। তৎপর প্রায় দুই শত দেশের সমন্বয়ে এই গ্লোবাল ভিলেজ। হয়তো কিছু কিছু ব্যাপারে মতানৈক্য থাকতেই পারে। কিন্তু সারা বিশ্বের মানুষ যখন বিপদাপন্ন হয়, তখন তো সবাই এগিয়ে আসে। যা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি অধুনা মহামারি কোভিড-১৯ এর প্রাক্কালে। এক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে, এই মহামারি থেকে বাঁচতে ভ্যাকসিন আবিষ্কার এবং এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার হাত। বস্তুত সভ্যতার আদিলগ্ন থেকেই ধনী গরীব রয়েছে। এটি কোনো সমাজেই হোক কিংবা কোনো দেশেই হোক বা বিশ্বজনীন ভাবেই হোক। এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন আঙ্গিকে সাহায্য সহযোগিতার প্রবহমান কার্যকলাপের ইতিবাচক ভূমিকা ছোট করে দেখার অবকাশ নেই। এ সূত্র ধরে এনজিও, দেশিও সংস্থা ও আন্তর্জাতিক দাতা সংগঠন বিভিন্ন শাখা ও উপশাখার সাহায্য সহযোগিতার কার্যক্রম অব্যাহত রেখে চলেছে। এ ব্যাপারে কিছু

নেতিবাচক বিষয় থাকলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গঠনমূলক ও হিতকর বলে প্রতীয়মান হয়। এ প্রেক্ষাপটে সমবায়ী দর্শনের আলোকে সাহায্য সহযোগিতার ব্যাপারে প্রত্যেকটি ধর্মে উল্লেখ থাকলেও ইসলাম ধর্মে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে সাহায্য সহযোগিতা একটা মহৎ কাজ। ভালো এবং কল্যাণকর কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করার ব্যাপারে প্রায় প্রত্যেক ধর্মে নির্দেশ রয়েছে। আর আঁতুর ঘর থেকে গোরস্তান বা শ্মশানে পৌঁছাতে গড়ে প্রায় ৭০ থেকে ৮০ বছরের সময় অতিক্রম করতে যে সকল ঘনিষ্ঠ, পরিচিত ও অপরিচিত মানুষগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এগিয়ে আসে, তার পেছনে থাকে সাহায্য ও সহযোগিতামূলক কম বেশি ত্যাগী সমবায়ী মনোভাব। এই মানুষগুলো সবাই যে একই প্রকৃতির এবং ত্যাগী, তা কিন্তু নয়। অনেক ক্ষেত্রে জটিল ও অনুদার মনোভাবের কারণে বেশ বাধার সম্মুখীন হতে হয়। অবশ্য সেক্ষেত্রে লক্ষ্যে পৌঁছানোর নিমিত্ত বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হয়।

আরেকটি কথা, জীবনে চলার পথে মানুষ কোনো না কোনো সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে। এদিকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে অর্থনীতির ভাষায় যে চারটি উৎপাদক আছে, তার মধ্যে মানুষ হলো জটিল ও রহস্যপূর্ণ, যা পূর্বেই কিছুটা উল্লেখ করেছি। তাই মানুষকে বিভিন্ন মোটিভেশনের মাধ্যমে প্রস্তাবিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিতে সামাজিক ও মনোবিজ্ঞানীদের চেষ্টার এতটুকু কমতি নেই। এ প্রেক্ষাপটে একটি প্রবচনের কথা মনে পড়ে যায়, যা হলো দৈহিক শক্তির বলে ঘোড়াকে পানির কাছে নেয়া সম্ভব। কিন্তু ঘোড়া পানি খাবে, কি খাবে না, তা তার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। আর এক্ষেত্রে মোটিভেশনের কথা ওঠে আসে। এ সূত্র ধরে মাসলো, ম্যাকগ্রেগর, হার্জবার্গ প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীদের মানবীয় উপাদান নিয়ে গবেষণার কমতি ছিল না এবং যা এখনও অব্যাহত আছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, মানবীয় উপাদান সমজাতীয় নয়। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় এবং জটিল। তাই এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সবাইকে এক সূত্রে গাঁথা কম কথা নয়? কিন্তু প্রশান্তির বিষয় হলো যে, মানবিক উপাদানগুলো মাইনাস-প্লাস করে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে শৃঙ্খলা সমুন্নত রেখে এগিয়ে যেতে সমবায়ের জুড়ি মেলা ভার। বস্তুত সমবায়ী কার্যকরী নীতির সুবাদে এক সদস্য থেকে অন্য সদস্যের মধ্যে সেতুবন্ধন রচিত হয় এবং একইভাবে একটি বৃত্তের আওতায় সেতুবন্ধন রচিত সকল সদস্যগণ বিদ্যমান থাকে। সকল সদস্যের মধ্যে সেতুবন্ধন বিদ্যমান থাকে। তাই একজন ইংরেজ বিশেষজ্ঞ উল্লেখ করেছিলেন যে, Co-operative is such society where bridges from one member to another member & in the same tune bridges among the total members in the same circle.

সত্যি কথা বলতে কি, সেই যে ১৭৮ বছর আগে ইংল্যান্ডের রচডেল গ্রাম থেকে প্রথম আনুষ্ঠানিক ও সমান্তরাল সফল সমবায় সমিতি যাত্রা শুরু করেছে। আর পেছন ফিরে তাকায়নি। ধীরে ধীরে সারা বিশ্বের প্রায় প্রত্যেকটি দেশে গভীর শেঁকড় গেড়ে বসেছে। এর সুবাদে লক্ষ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত এবং বিলিয়ন বিলিয়ন অর্থ প্রবাহের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক দেশের জিডিপিতে অবদান রেখে চলেছে। এ প্রেক্ষাপটে সম্প্রীতি, সহযোগিতা, শৃঙ্খলা, সেবা ও ত্যাগ সমুন্নত রেখে ব্যবসায়িক দিক দিয়ে সমবায়ী কার্যক্রম অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। তাছাড়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খণ্ড খণ্ড সঞ্চয় পুঞ্জীভূত করে মানি মার্কেটে এর ইতিবাচক ভূমিকা প্রণিধানযোগ্য।

এদিকে বাংলাদেশ যে অনুন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হয়েছে। এর পেছনে রয়েছে ক্রিয়াশীল অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে বিশেষ উপাদান হিসেবে সমবায়ী নীতি, যা কিছুটা গভীরে চিন্তা করলেই সহজে বুঝা যায়। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে বর্তমান প্রযুক্তির অন্যতম অবদান ইন্টারনেটের কথাই ধরুন। এটি যেমন, সারা জায়গায় ছেয়ে আছে। অথচ দেখা যায় না। কিন্তু মোবাইল বা কম্পিউটারে সার্চ দিলেই পাওয়া যায়। ঠিক সেই রকম অনানুষ্ঠানিক সমবায়ী নীতি সূক্ষ্ম ও সুপ্তভাবে সর্বক্ষেত্রে বিদ্যমান। এতদ্ব্যতীত অনেকে বলে থাকেন যে, সরকারি ও বেসরকারি যেকোনো সংগঠনের ম্যাগনেট বা চুম্বক হিসেবে সমবায়ী নীতি সহযোগিতা ও সম্প্রীতির মাধ্যমে সুশৃঙ্খলভাবে গতিময় করে তুলে থাকে। আর যদি চুম্বকত্ব হারিয়ে যায়; তাহলে শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে এবং এর ফলশ্রুতিতে সংগঠনের ছন্দপতন হয়। অথচ সেই সংগঠনের পটেনশিয়ালিটি থাকতেও মধ্য পথে রণভঙ্গ দিতে হয়। শুধু সংগঠন কেন, এটি পরিবার, সমাজ ও দেশের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। এ ব্যাপারে উল্লেখ্য যে, বর্তমানে সমবায়ী নীতি থাকলেও তা উপেক্ষা করার কারণে সম্প্রীতি, ত্যাগ ও বিশ্বাস হ্রাস পেয়েছে বলে যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবারে রূপ নিচ্ছে। অথচ সহমর্মিতার অভাবে একক পারিবারেও শান্তি নেই। আর একইভাবে সমাজ ও দেশে নৈরাজ্য, দলাদলি, বিশৃঙ্খলার কারণে একের পর এক নেতিবাচক ও দুঃখজনক ঘটনা ঘটে চলেছে, যা পরিবার, সমাজ, দেশ ও সারা অবনীতে ক্ষেত্র বিশেষে উন্নতি প্রভূত ব্যাহত করছে। তাই মানুষ যেহেতু সমাজবদ্ধ জীব। সেহেতু সমবায়ী নীতি কোনোক্রমেই অস্বীকার করার উপায় নেই।

সমবায় কার্যক্রম গণতান্ত্রিক। এখানে উপর থেকে নিচে বলে কোনো কথা নেই। সব কার্যক্রমই গণতান্ত্রিকভাবে সম্পাদিত হয়। আর এরই সূত্র ধরে সমান্তরালভাবে বার্ষিক সাধারণ সভা এবং যুগপৎ ব্যবস্থাপনা কমিটির (নির্বাচিত) মাসিক সভায় আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তবে মাঝে-মধ্যে সদস্যদের গোচরে রেখে উদ্দেশ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়ার পদক্ষেপসমূহ অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

পরিশেষে বলতে চাই যে, উপর্যুক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রকারান্তরে ওঠে এসেছে যে, এই মহতী সমবায়ী কার্যক্রম শৃঙ্খলাসহ উন্নতির ধারক ও বাহক। আর তাই এ ব্যাপারে হয়তো কারো ভিন্ন অভিমত প্রকাশের অবকাশ নেই বলে মনে করি।

সূত্র:

১. সামাজিক পরিবর্তন- খান রকিবুল আলম।
২. ব্যবস্থাপনা নীতিমালা- মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান।
৩. সময়ের আলো- ১১ ডিসেম্বর ২০২২

মো. আব্দুল বাকী চৌধুরী নবাব : বিশিষ্ট গবেষক, অর্থনীতিবিদ এবং লেখক হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মাননা ও পদকপ্রাপ্ত।

পাহাড়ি জুমচাষিদের অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সমবায় হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র

রত্ন কান্তি রোয়াজা

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলায় দশ ভাষাভাষি ১১টি আদিবাসীর বসবাস। তারমধ্যে জনসংখ্যায় চাকমা প্রথম, মারমা দ্বিতীয় ও ত্রিপুরা তৃতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। এরপর রয়েছে তঞ্চঙ্গ্যা, মুরুং, বম, খুমী, পাংখোয়া, খিয়াং, লুসাই ও চাক সম্প্রদায়-এরা সংখ্যায় কম। পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্ব নাম ছিল- কার্পাস মহল (১৭১৫-১৮৬০)।

তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার ১৮৬০ সালের ২০ জুন পার্বত্য চট্টগ্রামকে চট্টগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র জেলা ঘোষণা করে। এই পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তন বাংলাদেশের মোট আয়তনের দশ ভাগের এক ভাগ। তৎকালীন সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট আয়তনের ৮০% শতাংশ বনভূমি বা বনাঞ্চল ছিল। প্রাচীনকাল থেকে এ পার্বত্যাঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী পাহাড়ি জনগোষ্ঠী জুমচাষ করেই জীবিকা নির্বাহ করতেন। পাহাড়ে জুমচাষ করেই জীবনযাপন করার কারণে এই জনগোষ্ঠীকে পাহাড়ি নামে আখ্যায়িত করা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পার্বত্য চট্টগ্রামের শতকরা ৮০ জন মানুষ জুমচাষি এবং তাদের অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলো- জুমচাষ।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বিপুল পরিমাণ বনাঞ্চল ও পাহাড় থাকার কারণে তৎকালীন সময়ে এই পাহাড়ি জনগোষ্ঠীরা জঙ্গল কেটে পাহাড়ের উপর জুমচাষ করতেন। জুমচাষিগণ বৈশাখ মাসের দিকে জঙ্গল কেটে সাত থেকে দশ দিন রোদে শুকিয়ে রাখার পর আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। পুড়িয়ে ফেলার পর পুড়ে যাওয়া গাছ-বাঁশ, ঝোপঝাড় ও আগাছাগুলো দা দিয়ে কুপিয়ে মাটি নরম করে বীজধানসহ অন্যান্য শাকসবজির বীজ বপন করা হয়। প্রতিটি জুমচাষি পরিবার প্রায় তিন থেকে চার একর (৪০০ শতক) পাহাড়ের উপর প্রতি বছর জুমচাষ করে থাকে। তখনকার সময়ে বিপুল পরিমাণ পাহাড় বা বনাঞ্চল থাকায় জুমচাষিরা প্রতি বছর এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরিয়ে জুমচাষ করে থাকে। বীজ ধান বপনের পর চারা গজে উঠার প্রায় এক সপ্তাহ পর আবার দা দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করতে থাকে। জুমে ধান বপনের সাথে মারফা, চিনার, তিল, তুলা, কাউন ধান, ভুট্টা, শিম, কুমড়া, মরিচ, আদা-হলুদসহ আরো বিভিন্ন ধরনের শাকসবজির চাষ করা হয়। জুমচাষে অধিক ফসল ও বহু ধরনের শাকসবজি পাওয়ায় তখনকার সময়ে পাহাড়িরা জুমচাষে খুবই আগ্রহী ছিলেন।

ভাদ্র মাসের মাঝামাঝির দিকে জুম থেকে ধান কেটে তোলার পর গরু অথবা মহিষ দিয়ে ধান মাড়াই করে ঘরে মজুদ রাখা হয়। ধান কেটে তোলার পর জুমে অন্যান্য ফসলগুলো থেকে যাওয়ায় শেষ অবধি তারা জুম পরিচর্যা করে থাকে। এভাবে জুমচাষ করেই তাদের জীবন স্বাচ্ছন্দ্যে চলে।

পাহাড়ি জুমচাষিরা কঠোর পরিশ্রমী। জুমে ধান বপনের পর বেশ কয়েক মাস জুম পরিচর্যায় কঠোর শ্রম দিতে হয়। রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভীজে, মশা-মাছি ও চিংন্দা জোক এর উপদ্রব সহ্য করে সারাদিন জুম ক্ষেতে কায়িক শ্রম দিয়ে থাকে। এমনকি মশা-মাছির উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ছেড়া কাপড় দিয়ে রশি বানিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে কোমড়ে বেঁধে ও চিংন্দা জোক থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য পায়ে কেরোসিন মেখে তারা জুম ক্ষেতে গিয়ে কাজ করে।

আর জুমে ধান পাকার আগমুহূর্তে দিনের বেলায় বানর ও পাখী তাড়ানো আর রাতে বন্যশূকর ও ভাল্লুকের হাত থেকে জুম ক্ষেত রক্ষা করার জন্য রাত জেগে আগুন জ্বালিয়ে ও ঢোল বাজিয়ে জুমে অবস্থান করতে হয়। সে জন্য জুমচাষিরা ধান পাকার আগমুহূর্তে জুমে অবস্থান করার জন্য টং ঘর তৈরি করে রাখে।

জুমচাষিরা নানা প্রতিকূলতার মধ্যদিয়ে জীবনযাপন করতে হয়। পাহাড়ের কোনো কোনো জুমে অপ-দেবতা অবস্থান করায় জুমচাষিদের ঘরে অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকে। এমনকি অনেকের প্রাণহানির মতো ঘটনাও ঘটে থাকে। তাই এ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গণক করে সঠিক ও সুনির্দিষ্ট স্থান চিহ্নিত করে গ্রামের বৈদ্য দিয়ে ঐ স্থানটিতে পশু বলি ও তাবিশ গাড়িয়ে নানারকম তান্ত্রিক দ্বারা জুম থেকে অপ-দেবতা অপসারণ বা তাড়িয়ে দিতে হয়। এভাবে জুমচাষিরা জীবন-মরণ সংগ্রাম করে বেঁচে আছে। জুমে অধিক ফলনসহ বিভিন্ন প্রকারের তরি-তরকারি ও শাকসবজি পাওয়ায় সে কালের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীরা জুমচাষের উপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

অতীতে আদিবাসী পাহাড়ি জনগোষ্ঠীরা বাঘ-ভাল্লুকের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য উঁচু করে মাচাং ঘর তৈরি করে বসবাস করতেন। রান্নাবান্নাসহ খাবার পানি তারা ঝিরি, ঝরণা অথবা পাহাড়ের পাদদেশে মাটি খুঁড়ে কুয়া তৈরি করে সেখান থেকে সংগ্রহ করতেন। তখনকার সময়ে কোনো ধান চুরাই কল ছিল না। ঢেঁকি অথবা লোডে ধান ভরিয়ে হাতে ঢোকে চাল তৈরি করতেন। জুম থেকে তুলা এনে চরকায় সুতা বের করে চাদর ও পরিধানের পোশাক তৈরি করতেন। এভাবে তারা নিজ হাতে বানানো কাপড়চোপড় ব্যবহার করতেন।

জুমচাষি পরিবারের কারোর অসুখ হলে গ্রামের বৈদ্য দিয়ে চিকিৎসা করতেন। আদিবাসী পাহাড়িরা দেব-দেবী ও দেবতা পূজায় খুবই বিশ্বাসী।কারোর ঘরে কোনো অসুখ হলে তারা অপ-দেবতার খারাপ নজরে লেগেছে মনে করে জঙ্গলে অথবা ছড়া বা ডোবার পাশে গিয়ে মুরগি বলি দিয়ে পূজা করতেন। পাশাপাশি গ্রামের হাতুড়ে বৈদ্য দিয়ে চিকিৎসা করতেন। গ্রামের বৈদ্যরা চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষ করে লতাপাতা যেমন- তুলসী পাতা, লেলাং পাতা, নুনিয়া, পুই, করলা, জিরা, কামরাঙ্গা, কালোজাম, রসুন, পুদিনা, শিমুল আলু, কলমী, পাথর কুচি, হলুদ, আদা, সজনা, চন্দ্র মল্লিকা, কলিয়াস, ঘৃত-কুমারী, তেঁতুল, থানকুনী ইত্যাদি দিয়ে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করে থাকে। কোলের বাচ্চা অথবা শিশুদের বেলায় তারা মন্ত্র জপিয়ে জারিয়ে চিকিৎসা দেয় ও তাবিশ দেয়।

হস্তজাত শিল্পেও তখনকার সময়ে আদিবাসী পাহাড়িরা খুবই পারদর্শী ছিলেন। বিশেষ করে ধান রাখার জন্য বেত দিয়ে ঢোল, ঝুড়ি, কুলা, তলইসহ ছোটখাটো মালামাল বহনের জন্য ছোট-বড়, মাঝারি বিভিন্ন ধরনের ঝুড়ি তৈরি করতেন। এছাড়া ও হাতপাখা, ঝুমুর, লুই, চকড়া, ডুব ইত্যাদি হাতে তৈরি করতেন। চিত্তবিনোদনের জন্য গাছ দিয়ে ঢোল, বাঁশের বাঁশি ও দাংদু বানাতেন। বিবাহসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ঢোল ও বাঁশি বাজিয়ে উৎসব করতেন। এভাবেই আদিবাসী পাহাড়ি জনগোষ্ঠীরা সুখে জীবনযাপন করতেন।

কিন্তু তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ২১ আগস্ট পরিবার প্রতি ৪ টাকা জুম কর নির্ধারণ করে এবং ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে তা কার্যকর করা হয়। ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর রাজস্ব সংগ্রহের সুবিধার্থে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ৩টি সার্কেলে বিভক্ত করে- চাকমা সার্কেল, বোমাং সার্কেল ও মং সার্কেল সৃষ্টি করা হয়। মোট ৩৩২টি মৌজা সৃষ্টি করে চাকমা সার্কেলে-১৪৪টি, বোমাং সার্কেলে-৯৫টি এবং মং সার্কেলে-৮৩টি মৌজা ভাগ করে দিয়ে হেডম্যানদের মাধ্যমে ভূমিকর আদায়করা হয়।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান সরকার ব্রিটিশের সে আইন বলবৎ রাখে। ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে প্রায় ১ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে এবং প্রায় ৫৪ হাজার একর জমি প্লাবিত হয়। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদেরকে পাহাড়ের বিভিন্ন এলাকায় পুর্ণবাসিত করা হলে আদিবাসী জুমচাষিদের অবাধে জুমচাষের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা ছয় থেকে সাত লক্ষ কিন্তু বর্তমানে প্রায় বিশ লক্ষ এর কাছাকাছি। বহিরাগতদের অনুপ্রবেশসহ জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পাহাড়ের মাটির উর্বরা শক্তি কমে যাওয়ায় জুমচাষিরা আজ নিঃস্ব। ১৯৭৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। পার্বত্য এলাকার বনভূমি বা পাহাড় বন্দোবস্ত ছাড়াই পাহাড়িরা ভোগদখল করে আসতেছে-ব্রিটিশ রাজত্ব থেকে। কিন্তু পাহাড়িদের এই বন্দোবস্তবিহীন পাহাড় ও বনাঞ্চলগুলো বোর্ডের আওতায় এনে রাবার বাগান ও যৌথখামার করে বেশ কয়েক হাজার পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়। এর ফলে পাহাড়ের বনজঙ্গল কেটে সেখানে রাবার বাগান ও যৌথখামার করে দেয়া হয়। অন্যদিকে বনবিভাগ জুমিয়া পুনর্বাসন নামে পাহাড়ের বনভূমি অধিগ্রহণ করে সেখানে সেগুন বাগানসহ বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষ রোপণ করে পাহাড় দখল করে নেয়। এর ফলে বনভূমি ও পাহাড় সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং জুমচাষ করার মতো পর্যাপ্ত পাহাড় কমে যাওয়ায় পাহাড়ি জনগোষ্ঠীদের মধ্যে জুমচাষ ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে।

জুমচাষিরা তাদের পূর্বপুরুষদের পেশা অনুকরণ করে পাহাড়ে জুমচাষ ও বনের গাছ-বাঁশ কেটেই মূলত জীবিকা নির্বাহ করতেন। কিন্তু ১৯৮৮ সালে একটি সরকারি আদেশ বলে জুমচাষকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং আইন অমান্যকারীর জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে সরকার ১৯৮৮ সালের আদেশ বলবৎ রেখেই সীমিত জুমচাষ করার অনুমতি দেয়।

বনাঞ্চলের মাটি, পানি, বাতাস ও গাছপালার সাথে যাদের নিবিড় সম্পর্ক এবং যুগ যুগ ধরে যারা পাহাড়ি এলাকার বনাঞ্চলে বসবাস-এই পাহাড়িরা কোনোভাবেই পাহাড় বা বনাঞ্চল ছাড়তে চায় না। কারণ এসব জনগোষ্ঠী পূর্ব থেকে যে বনাঞ্চলে বসবাস করতেন সে বনাঞ্চলের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এখনও পুরোপুরি ছেদ পড়েনি। অতীতে বনের এই অধিবাসীরা কখনো এক জায়গায় স্থায়ীভাবে জুমচাষ না করায় আইনের ফাঁদে পড়ে আজ তারা এই সম্পদের অধিকার হারায়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যাপক হারে বনভূমি ধ্বংস, বৃক্ষ নিধন এবং পাথর উত্তোলনের ফলে পাহাড়ের ঝিরি, ঝরনা সব শুকিয়ে যাচ্ছে। অতীতে পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট আয়তনের ৮০% বনভূমি ছিল কিন্তু অবাধে বৃক্ষ নিধন, অপরিকল্পিতভাবে পাহাড় কেটে বসতবাড়ি নির্মাণের ফলে আজ পাহাড়ের বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

বর্তমানে এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও যারা এখনো জুমচাষ করে টিকে আছে এবং প্রাচীন ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে- তাদের জন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা একান্তই প্রয়োজন। আজও তারা বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির ছোঁয়াও আলো দেখেনি। তাই এই অবহেলিত প্রান্তিক জুমচাষি জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও তাদের অস্তিত্ব সংরক্ষণে সরকারি সহায়তা প্রয়োজন। আর এই সহায়তা একমাত্র সম্ভব- সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে। এই প্রান্তিক জুমচাষি জনগোষ্ঠীদের সংগঠিত করে সমবায় কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করে সমবায়ের ধ্যানধারণা তাদের মধ্যে লালন করতে পারলে তারা নিজেরাই সংগঠিত হয়ে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নে উদ্যোগী হবে। তার আগে সমবায় বিভাগের তত্ত্বাবধানে সমবায় বিষয়ক কর্মকাণ্ডে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে ও প্রশিক্ষণ দিয়ে আর্থসামাজিক উন্নয়নের মূলধারায় পৌঁছে দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। আর সে দায়িত্ব সমবায় বিভাগের উপর অর্পণ করতে হবে। সমবায় বিভাগ সঠিক দিক-নির্দেশনা দিয়ে এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সমবায় কার্যক্রমের মূলধারায় নিয়ে আসতে পারলে তারা আর্থিকভাবে লাভবান হবে। তার সাথে পার্বত্যাঞ্চলের আদিবাসী পাহাড়িদের জুমচাষ প্রথাকে ধরে রাখা সম্ভব হবে ও তাদের অস্তিত্ব রক্ষা হবে।

বাংলাদেশের স্থপতি ও রূপকার হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে বলেছেন, আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে-এটাই আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। আর তারই উত্তরসূরি বঙ্গবন্ধুর মানস কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমার দেশের কোনো মানুষ অনাহারে থাকবে না, সবাই পেট ভরে খাবে এবং দেশের সকল মানুষ সমান সুযোগ সুবিধা পাবে। তিনি ২০৩০ সালে মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ১০ টি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তারমধ্যে ১ম উদ্যোগ একটি বাড়ি একটি খামার-যা সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম দ্বারা পরিচালিত। এই একটি বাড়ি একটি খামার এখন পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক নামে সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জের প্রান্তিক মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সমবায় বান্ধব। তিনি সমবায়ীদের উন্নয়নে সর্বোচ্চ নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও সততার সাথে কাজ করে যাচ্ছেন এবং সমবায়কে বেগবান করে তোলার জন্য নেতৃত্ব প্রদান করে চলেছেন। ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সব উদ্যোগ একে একে বাস্তবায়ন হতে চলেছে। সবার জন্য বাসস্থান এর উদ্যোগ হিসেবে তিনি আশ্রয়হীন মানুষের জন্য আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহহীনদের গৃহের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তিনি ভিশন ২০২১ এর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়েছেন এবং ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এগিয়ে যাচ্ছেন। তিনি স্বপ্নের পদ্মাসেতু নিজের দেশের অর্থায়নে বাস্তবায়ন করে দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের যোগাযোগের দ্বার খুলে দিয়েছেন। বাংলাদেশের উন্নয়নে যা যা করার প্রয়োজন তিনি তা করে যাচ্ছেন। আশা করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্যাঞ্চলের আদিবাসী পাহাড়ি জুমচাষি জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নেও সহযোগিতার হাত বাড়াবেন।

ময়মনসিংহের গারো সম্প্রদায়ের উন্নয়নে সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে যেভাবে প্রকল্প গ্রহণ করে তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন করেছেন ঠিক সেভাবে এই পার্বত্যাঞ্চলের আদিবাসী পাহাড়ি জুমচাষি জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সমবায় বিভাগের মাধ্যমে বিশেষ প্রকল্প প্রদান করে বাস্তবায়ন করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদৃষ্টি কামনা করছি।

সবশেষে এটাই বলতে চাই-পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী পাহাড়ি জুমচাষি জনগোষ্ঠী প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে এই এলাকায় বসবাস করে এসেছেন। কারণ

এসব জনগোষ্ঠী পূর্ব থেকে যে বনাঞ্চলে বসবাস করতেন সে বনাঞ্চলের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এখনও পুরোপুরি ছেদ পড়েনি। কিন্তু কালের আবর্তে তাদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহের জন্য যেটুকু প্রকৃতিজাত বনাঞ্চল প্রয়োজন সে বনাঞ্চল আজ ক্রমশ ধ্বংস করে চলেছে। এই জনগোষ্ঠীরা আজ সবচেয়ে পিছিয়ে আছে। যারা যুগ যুগ ধরে পাহাড়ি এলাকায় বনাঞ্চলে বসবাস করেছে এবং বন রক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছে- তাদের অস্তিত্ব আজ হুমকির মুখে। সুতরাং তাদের পুনর্বাসনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদৃষ্টি কামনা করছি। তার সাথে এসব জনগোষ্ঠীকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করে স্বদেশের ধারাবাহিক উন্নয়নে সামিল করার জন্য বিনীত আবেদন জানাচ্ছি।

আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, নওগাঁ'র

প্রশিক্ষণ কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ বাস্তবায়নে করণীয়

অনিরুদ্ধ মুখার্জী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত স্বপ্ন- জেন্ডার, ধর্ম, বর্ণ ও বৈষম্যহীন এক ন্যায্য সমাজের স্বপ্নকে বাস্তবরূপ দিতে বর্তমান সরকার মানব উন্নয়ন, জেন্ডার ক্ষমতায়ন ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ অনুসারে বাংলাদেশ একটি উন্নত দেশে পরিণত হবে যখন এর জনগণের মাথাপিছু আয় দাঁড়াবে ১২৫০০ মার্কিন ডলার এবং এদেশে দারিদ্র্যের হার হবে শূন্যের কোঠায়। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হবে চারটি মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে যার মধ্যে ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ইতোমধ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১ কোটি ১৬ লাখ ৭০ হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে দেশের অভ্যন্তরে ৮৪ লাখ ২০ হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। অপরদিকে সমবায় অধিদপ্তর স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে শতবর্ষ ধরে দেশের সমবায়ীদের মাঝে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। সমবায় অধিদপ্তরের ভিশন হলো 'টেকসই সমবায় গঠনের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা'। আবার সমবায় অধিদপ্তরের অভিলক্ষ্য হলো সমবায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই সমবায় গড়ে তোলা। অর্থাৎ দক্ষ জনবল ও উদ্যোক্তা গড়ে তোলার মাধ্যমে এদেশে স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

সমবায় অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং প্রসঙ্গত পরিবর্তনসমূহ

সমবায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং তাদেরকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সমবায় অধিদপ্তর বিভিন্ন ট্রেডে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। সমবায়ীদের জন্য এই আয়বর্ধন মূলক সমবায় অধিদপ্তরের অধীন বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও এর অধীনস্থ আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটগুলোতে যেমন আয়োজন করা হচ্ছে, তেমনি জেলা-উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে জেলা সমবায় কার্যালয়ের নেতৃত্বে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হচ্ছে। এই আয়বর্ধন মূলক প্রশিক্ষণসমূহের বেশিরভাগেরই মেয়াদ ৫ দিন; আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটে আয়োজিত আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণসমূহের মেয়াদ ৫-১০ দিন। আয়োজিত এই প্রশিক্ষণসমূহের বড় দুর্বলতা এই যে, এখানে অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান সৃজন হয়। প্রায়ই অনুযোগ আসে যে, এই স্বল্প মেয়াদের প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত সনদের আনুষ্ঠানিক খাতে কোনো মূল্যায়ন হয় না বললেই চলে। এই অনুযোগের ভিত্তিতেই বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটসমূহের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় ২০২২-২৩ অর্থবছর থেকে বেশ পরিবর্তন এসেছে।

অপরদিকে সারাদেশের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ/বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের উন্নয়ন, মনিটরিং, জবাবদিহিতা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একই স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখতে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের প্রতিটি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণেরই যেন সনদমূল্য থাকে এবং প্রশিক্ষণার্থীগণ দেশে বিদেশে আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানে যুক্ত হতে পারে, সেই লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন NSDA কাজ করছে। NSDA কর্তৃক নির্ধারিত Competency Based Training এর আওতায় যেকোনো একটি ট্রেডে কোনো প্রশিক্ষণার্থীকে কমপক্ষে ৪২০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হয়। প্রশিক্ষণ শেষে একটি মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণ NSDA থেকে সরাসরি ট্রেডনির্ভর সনদ পেয়ে থাকেন। এখন বাস্তবতা হলো, দেশের সকল ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে আজ অথবা কাল NSDA এর নির্ধারিত পথ অনুসরণ করে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে অনেক চ্যালেঞ্জের মধ্যে বাজেট স্বল্পতা, অবকাঠামো দুর্বলতা, ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষকের অভাব ইত্যাদি হলো বড় বাধা। এরকম বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত গত ১৪ জুন, ২০২২ তারিখের একটি কর্মশালার মাধ্যমে অধীনস্ত আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটের বার্ষিক প্রশিক্ষণ কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ নির্ধারিত হয়েছে। আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, নওগাঁ'র প্রশিক্ষণ কর্মপরিকল্পনাসহ

সার্বিক পরিকল্পনায় NSDA সাথে সামঞ্জস্য রেখে যে পরিবর্তনসমূহ এসেছে, তা হলো-

(ক) চারটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেডের (টেইলারিং [ইলেকট্রিক মেশিনে], মোবাইল সার্ভিসিং, ইলেকট্রিক্যাল ও হাউজ ওয়্যারিং এবং বিউটিফিকেশন) প্রশিক্ষণের মেয়াদ বাড়িয়ে ৬০ দিন করা হয়েছে, যা পূর্বে ৫-১০ দিন ছিল। উল্লেখ্য যে, এসকল ট্রেডসহ প্রায় সকল আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ ট্রেডে সময় বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের দিক থেকে একধরনের সুপারিশও ছিল।

(খ) আইজিএ সেলাই প্রশিক্ষণের মেয়াদ বাড়িয়ে ১০ দিন থেকে ২১ দিন করা হয়েছে।

(গ) অন্যান্য আইজিএ প্রশিক্ষণের মেয়াদ ক্ষেত্রবিশেষে ৫ দিন থেকে বাড়িয়ে ১২ দিন করা হয়েছে।

ঘ) আইজিএ প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদেরকে উদ্যোগী হিসেবে গড়ে তুলতে a2i এর ম্যানুয়াল অনুযায়ী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(ঙ) বিভাগীয় প্রশিক্ষণসমূহের মেয়াদও বৃদ্ধি করা হয়েছে।

(চ) প্রশিক্ষণসমূহের মেয়াদ বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রশিক্ষণ অনুযায়ী সম্ভাব্য বাজেট প্রস্তাব যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

(ছ) এ প্রশিক্ষণসমূহকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে আসই, নওগাঁর অবকাঠামো সেটআপ যুতসই করার দিকে নজর দেওয়া হয়েছে।

আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, নওগাঁ'র প্রশিক্ষণ কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে সামঞ্জস্য রাখার পাশপাশি অনানুষ্ঠানিক খাতে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, নওগাঁর বার্ষিক প্রশিক্ষণ কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। এখানে অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ বলতে বুঝানো হয়েছে এমন সকল প্রশিক্ষণকে সাধারণ সমবায়ীগণ যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে মূলত স্থানীয়ভাবে নিজের পরিবারের আর্থিক উন্নয়নে কিংবা স্বকর্মসংস্থানে কাজে লাগাবে; তারা এই প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কিংবা প্রাপ্ত সনদ ব্যবহার করে কোথাও চাকরির প্রত্যাশা করেন না। আবার, ৫ দিনব্যাপী এসকল আইজিএ প্রশিক্ষণসমূহ NSDA এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলেও এর গুরুত্ব একেবারেই ফেলে দেওয়ার মত না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ৫ দিনব্যাপী গাভি পালন প্রশিক্ষণের কথা। এখানে অনেক মহিলা সমবায়ী সনদ ও চাকরিপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে আসেন না; তারা মূলত তাদের পরিবারে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আর্থিক উন্নয়নের কথাই ভাবেন।

অর্থবছর ২০২২-২৩ সনে আসই, নওগাঁ মোট ২৫টি প্রশিক্ষণ আয়োজনের পরিকল্পনা করেছে। পেছনের দিকে তাকালে দেখা যায়, অর্থবছর ২০২১-২২ এ মোট ৩৭টি প্রশিক্ষণ কোর্সের পরিকল্পনা করা হলেও বাজেট স্বল্পতার কারণে মাত্র ৩২টি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা সম্ভব হয়। আবার গত অর্থবছরের প্রশিক্ষণসমূহের মেয়াদ সর্বোচ্চ ১০ দিন ছিল। সে প্রেক্ষিতে ২০২২-২৩ সনের ২৫টি প্রশিক্ষণ সংখ্যায় কম মনে হলেও ব্যাপ্তিতে অনেক বেশি।

প্রশিক্ষণ কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, নওগা'র বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২২-২৩ তথা এবছরের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা অনেক দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ এবং চ্যালেঞ্জিং। অনেক দিনের চলে আসা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে অনেকটাই নতুন করে সাজানো হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অনেক প্রশিক্ষণের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নসহ কার্যকর প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য আর্থিক সংস্থান জরুরি। এছাড়া এই প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনবল, অবকাঠামোগত অনেক চ্যালেঞ্জ দূর করা প্রয়োজন। এজন্য কেবল আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, নওগাঁ নয়, সেই সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রশিক্ষণ কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে করণীয় নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরা হলো-

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য যেমন প্রশিক্ষণার্থী পর্যায় থেকেই সুপারিশ ছিল; তেমনি উল্টোভাবে ৬০ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থী (বিশেষ করে নারী প্রশিক্ষণার্থী) খুঁজে পাওয়া দুরূহ হয়ে পড়বে। এক্ষেত্রে জেলা ও উপজেলা সমবায় কার্যালয় প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

প্রশিক্ষণার্থীদের চাহিদামাফিক প্রশিক্ষণ ট্রেড গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রেও প্রকৃত আগ্রহী ও প্রশিক্ষণনির্ভর উদ্যোগী হতে ইচ্ছুক, এমন সমবায়ীকে খুঁজে বের করা ছাড়া এই পরিকল্পনা কার্যকর করা দুরূহ হবে।

জেলা সমবায় কার্যালয় হতে প্রদত্ত মাঠপর্যায়ে আইজিএ প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের মধ্যে থেকে বাছাই করে আগ্রহী প্রশিক্ষণার্থীদেরকে আসই, নওগাঁতে অধিকতর সুযোগ প্রদান করা দরকার। সবাইকে অল্প কিছু হলেও, কার্যকরভাবে সেই অল্পজনকেই প্রকৃত উদ্যোগী হিসেবে গড়ে তুলতে পারাই সার্থকতা।

দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করার ক্ষেত্রে তাদের জব প্লেসমেন্টের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা দরকার। এক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

ভালো ও আগ্রহী প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন করা ব্যতীত গৃহীত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ফলপ্রসূ করা সম্ভব নয়। আসই-সমূহ প্রশিক্ষণ প্রদানের মূল ভূমিকা পালন করলেও তাদের কার্যক্রম ম্রিয়মাণ হয়ে যাবে, যদি না উপজেলা সমবায় কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে আন্তরিক না হন। আমি মনে করি, আসই কর্তৃক একটি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যকর করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে একজন উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা।

এই প্রশিক্ষণ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হলে অবশ্যই যথাযথ অর্থের সংস্থান থাকা জরুরি। অথচ করোনা পরিস্থিতি এবং দুর্যোগের কারণে এ খাতে সরকারের আর্থিক সংস্থান অনেকটাই কমে গেছে। এ বিষয়ে সংকট দূর করতে সমবায় অধিদপ্তরকে অবশ্যই সর্বোচ্চ ভূমিকা পালন করতে হবে।

প্রশিক্ষণপরবর্তী পর্যায়ে প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান সঠিকভাবে ব্যবহার করছে কি না বা উদ্যোগ গ্রহণ করছে কি না; তা জানতে বাৎসরিক ভিত্তিতে প্রশিক্ষণোত্তর মূল্যায়ন করতে হবে।

উত্তর আমেরিকার সমবায় সমিতি ও আমরা

রাফায়েল পালমা, কানাডা থেকে ফিরে

বাংলাদেশের সমবায় সমিতির সাথে আমরা বাঙালিরা প্রায় সবাই পরিচিত। আমাদের দেশের সমবায় সমিতির মূল মডেলটি শুরু হয়েছিল কানাডা থেকে। কানাডার নভাস্কশিয়া প্রদেশের সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স ইউনিভার্সিটির অধীনে Coady International Institute যে মডেল উদ্ভাবন করেছিল সেই মডেলটিই আমাদের দেশের সমবায়ে প্রচলিত রয়েছে।

আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ কানাডা। এর নভাস্কশিয়া প্রদেশের একটি অঞ্চলের নাম এন্টিগোনিশ। এই অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দাদের জন্য যে সমবায় মডেলটির প্রচলন করা হয়েছিল, প্রায় শতবর্ষ পূর্বের সেই মডেলটিই তৎকালীন পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশে) প্রচলন করা হয়।

ফাদার চার্লস জে. ইয়াং সিএসসি কানাডার সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স ইউনিভার্সিটির Coady International Institute থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে 'ঢাকা ক্রেডিট'-এর অর্থাৎ 'দি খ্রিষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা'র গোড়াপত্তন করেন। ২৫ জন সদস্য ও ৫০ টাকা মূলধন নিয়ে এর যাত্রা শুরু হলেও এর বর্তমান সদস্য প্রায় পঞ্চাশ হাজার নারী-পুরুষ এবং মূলধন প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা। এই সমিতিই বর্তমানে বাংলাদেশে সবচেয়ে বৃহৎ সমবায় সমিতি হিসেবে বিবেচিত। কানাডার প্রাচীন এন্টিগোনিশ পদ্ধতিই আমাদের বাংলাদেশের সমবায় সমিতিগুলোতে বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে।

এন্টিগোনিশ মডেল আবিষ্কারের পর এই পদ্ধতি কানাডার বড় বড় শহরেও প্রচলিত হয়েছিল। কালের আবর্তে সত্তর দশকের দিকে এই মডেল কিছু চ্যালেঞ্জ-এর সম্মুখীন হয়। ফলে সেসব সমবায় উদ্যোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়। মূল চ্যালেঞ্জ ছিল চাকরির জন্য ওখানকার বাসিন্দারা স্থানান্তরিত হয়ে নানান স্থানে চলে যাচ্ছিল, এতে সমবায় কার্যক্রমে নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়।

পরবর্তীতে কানাডার বৃহৎ ক্রেডিট ইউনিয়নগুলো ব্যাংকের আদলে কার্যক্রম শুরু করে। এগুলোর পরিচালনার জন্য ব্যাংকের ন্যায় পেশাদারি কর্মচারীর প্রয়োজনের তাগিদ সৃষ্টি হয়; ফলে কর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে সেগুলো পরিচালিত হয়ে আসছে। উদাহরণস্বরূপ- যেকোনো একটি ক্রেডিট ইউনিয়ন শুরু করতে গেলে কমপক্ষে ৫.৫ মিলিয়ন ডলার মূলধনের প্রয়োজন হবে এবং ন্যূনতম সদস্য হতে হবে ১ হাজার জন। বর্তমানে এরূপ বৃহৎ ও উল্লেখযোগ্য ক্রেডিট ইউনিয়নগুলোর মধ্যে রয়েছে De Sargion Credit Union, Ukranian Credit Union, Chinese Credit Union, Teachers Credit Union ইত্যাদি।

কানাডায় বর্তমানে প্রধানত ১০ ধরনের কো-অপারেটিভ কার্যক্রম প্রচলিত রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে : ১) কনজ্যুমার কো-অপারেটিভ, (২) ওয়ার্কস কো-অপারেটিভ (৩) প্রোডিউসার্স বা প্রসেজিং কো-অপারেটিভ (৪) সার্ভিস কো-অপারেটিভ (৫) হাউজিং কো-অপারেটিভ (৬) মার্কেটিং কো-অপারেটিভ (৭) ডে-কোয়ার বা চাইল্ডকেয়ার কো-অপারেটিভ (৮)

সাপ্লাই কো-অপারেটিভ (৯) ফার্মিং অ্যান্ড এগ্রিকালচার কো-অপারেটিভ এবং (১০) ফিনান্সিয়াল কো-অপারেটিভ।

(১) কনজ্যুমার কো-অপারেটিভ : এই কো-অপারেটিভকে রিটেইল কো-অপারেটিভও বলা হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে খুচরা দোকান পরিচালনা করা হয়ে থাকে এবং এসব দোকানকে এর সদস্যগণ নিজেদের দোকান হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। সদস্যরা নিজেদের কো-অপারেটিভ-এর জনসমষ্টিকে একটি 'সমাজ' হিসেবে দেখে থাকে বা স্থানীয় দল হিসেবে মনে করে। কারণ, ওই নির্দিষ্ট দোকানের ভোক্তা ও তাদের নিজেদের মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে সেই খুচরা দোকানগুলো পরিচালিত হয়ে থাকে। তারা জেনারেল স্টোর, মুদি দোকান, খাবারের দোকান ইত্যাদি পরিচালনা করে থাকে। প্রয়োজনে তারা দোকান পরিচালনার জন্য সদস্য নয় এমন লোকদের কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ দিয়ে থাকে।

(২) ওয়ার্কস কো-অপারেটিভ : এই কো-অপারেটিভের সদস্যগণ ব্যবসায়ের কর্মী এবং মালিক হিসেবে নিজেদের বিবেচনা করে। এই কো-অপারেটিভটি সবচেয়ে বেশি প্রচলিত কানাডাতে। উদাহরণস্বরূপ- বেকারি, খুচরা নানাবিধ পণ্যের দোকান, সফটওয়্যার ফার্ম, অক্যুয়াকালচার, রেস্টুরেন্ট, ট্যাক্সি কোম্পানি, ইত্যাদি এই কো-অপারেটিভ দ্বারা পরিচালিত হয়।

(৩) প্রোডিউসার্স বা প্রসেজিং কো-অপারেটিভ : প্রোডিউসারগণ নিজেরাই এই কো-অপারেটিভের সূচনাকারী। তারা নিজেরাই এই উদ্যোগের মালিক। তারা নিজেরা একত্রিত হয়ে বা আলাদাভাবে এই কো-অপারেটিভ সৃষ্টি করতে পারে এবং তাদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন এবং বিতরণ করতে পারে। তার মধ্যে থাকতে পারে কৃষিজাত পণ্য, কাঠ, কাঠের বা অন্য যেকোনো উপাদানের তৈরিপণ্য, হস্তশিল্প, ইত্যাদি।

(৪) সার্ভিস কো-অপারেটিভ : এই কো-অপারেটিভটি কনজ্যুমার কো-অপারেটিভের মতোই কাজ করে। একটি কম্যুনিটির প্রয়োজন মেটানোই এর কাজ। এই কো-অপারেটিভের পণ্য বা সেবা সদস্যরা নিজেরাই সৃষ্টি করে এবং এর ব্যবহারের ওপরও তাদের প্রায় পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। এতে নিজেরাই কর্মী হতে পারে আবার অন্য পেশাদার কর্মী নিয়োগ দিয়ে উদ্যোগ পরিচালনা করতে পারে। যেমন- চাইল্ডকেয়ার, হেলথকেয়ার ক্লিনিক, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সেবা, ইত্যাদি।

(৫) হাউজিং কো-অপারেটিভ : এই কো-অপারেটিভ বাড়ির মালিক হওয়ার জন্য সদস্যদের অনন্য সেবা দিয়ে থাকে। অ্যাপার্টমেন্টের ইউনিটগুলোর সবগুলোই কো-অপারেটিভের মালিকানায় থাকে। তবে সেগুলোতে বসবাসকারী কোনো সদস্যই সেই ইউনিট বিক্রি করতে পারবে না, বা সেখান থেকে কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ লাভ করতে পারবে না। উদ্যোগগুলোর মধ্যে রয়েছে অ্যাপার্টমেন্ট, হাউজিং করার লক্ষ্যে ক্রয়কৃত জমি, দোকান, ইত্যাদি।

(৬) মার্কেটিং কো-অপারেটিভ : এই কো-অপারেটিভ সদস্যদের প্রডাকশন উদ্যোগে কাঁচামাল জোগান দিয়ে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। লাভের লক্ষ্যে এই কো-অপারেটিভ তাদের উৎপাদিত পণ্য সদস্যসহ অন্য ক্রেতার কাছেও বিক্রি করে থাকে। যেমন- নানা রকম ফলের জুস, ডেইরি পণ্য, শস্য, ইত্যাদি।

(৭) ডে-কোয়ার বা চাইল্ডকেয়ার কো-অপারেটিভ : সদস্যগণ স্ব-উদ্যোগে এই কো-অপারেটিভ গঠন করলেও এর সেবা সদস্যসহ অন্যান্য সাধারণ জনগণও এর উপকারভোগী হতে পারে। সদস্যরা নিজেরা বা নিয়োগকৃত কর্মী দ্বারা ডে-কেয়ার বা চাইল্ডকেয়ার পরিচালনা করে থাকে।

(৮) সাপ্লাই কো-অপারেটিভ : এই কো-অপারেটিভের সদস্যগণ বিভিন্ন বা একক মালিকানাধীন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে থাকে। সদস্যরা নিজেরা বা নিয়োগকৃত কর্মী দ্বারা এসব সরবরাহের কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে।

(৯) ফার্মিং অ্যান্ড এগ্রিকালচার কো-অপারেটিভ : সরকারি কোনো জমি লিজ নিয়ে বা কৃষিজমি ক্রয় করে সদস্যরা কো-অপারেটিভের মাধ্যমে শ্রমিক দিয়ে চাষাবাদ করে থাকে। বছরের বেশির ভাগ সময় তুষারপাতে জমি আবৃত থাকলেও গ্রীষ্মকালে তিন থেকে পাঁচ মাসের মধ্যে নানা ফসল উৎপাদন করে থাকে। এমনকি কখনো কখনো স্বল্প মজুরিতে আশপাশের দেশ থেকে (যেমন- মেক্সিকো থেকে) চাষাবাদের জন্য শ্রমিকদের নিয়োগ দেওয়া হয়ে থাকে।

(১০) ফিনান্সিয়াল কো-অপারেটিভ : এই কো-অপারেটিভ একটি ঐতিহ্যগত ব্যাংকের মতোই কাজ করে থাকে। স্বীয় সদস্যদের দ্বারাই পরিচালিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো সমমনা সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতামূলক বিমা, ঋণসেবা ও বিনিয়োগের সুবিধা পেতে পারে। যেমন- ক্রেডিট ইউনিয়ন, ট্রাস্ট ও কোম্পানি ইত্যাদি ফিনান্সিয়াল কো-অপারেটিভ।

ওপরে উল্লিখিত কো-অপারেটিভগুলোর মধ্যে আমাদের বাংলাদেশে হাউজিং ও কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন প্রচলিত রয়েছে (অন্যগুলোর অস্তিত্ব নেই বললেই চলে)। এই দুই ধরনের প্রতিষ্ঠানে সদস্য সংখ্যার কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। অন্য আট প্রকার কো-অপারেটিভের মূল উদ্দেশ্য হলো অংশীদারিত্বমূলক ব্যবসা পরিচালনা করা। এসব কো-অপারেটিভগুলো তাদের সদস্যদের একসাথে-এককালীন সংগৃহীত মূলধন দ্বারা তাদের ব্যবসা শুরু করে থাকে।

উল্লিখিত আট প্রকার কো-অপারেটিভ আমাদের বাংলাদেশে প্রচলনে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি বা শুরু করলেও সফলতা অর্জন করতে পারেনি বা লাভজনক প্রতিষ্ঠানরূপে পরিচিতি লাভ করতে পারেনি। কোনো কোনো ক্রেডিট ইউনিয়ন এই ঘরানার পদক্ষেপ নিলেও দূরদৃষ্টি, সততা, সহমর্মিতা, স্বচ্ছতা, পেশাগত দক্ষতা ও আন্তরিকতার অভাবে লাভের মুখ দেখতে পায়নি।

যদিও বাংলাদেশে আমরা সমবায়ের ক্ষেত্রে 'কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড' শিরোনাম ব্যবহার করে থাকি, মূলত ক্রেডিট ইউনিয়ন একটি ফিনান্সিয়াল কো-অপারেটিভের অধীনে একটি ঋণদান প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান ঋণদান কার্যক্রমের বাইরেও বিভিন্ন লাভজনক প্রকল্প গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং, ক্রেডিট ইউনিয়ন ১০টি কো-

অপারেটিভের মধ্যে একটি ফিনান্সিয়াল কো-অপারেটিভ বা ক্রেডিট ইউনিয়ন।

বলতে দ্বিধা নেই যে, নিউইয়র্কের মতো একটি বৃহৎ শহরের (প্রবাসী বাংলাদেশিদের দ্বারা গঠিত) প্রথম ও একমাত্র 'খ্রিষ্টান সোর্স এন্ড সলিউশন' নামক ঋণদান সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়। নানা অব্যস্থাপনার কারণে লোকসানের ফলে এর বিপর্যয় নেমে আসে এবং সাধারণ সদস্যদের শেয়ারের অর্থ ফেরত দিয়ে সমিতিকে চিরতরে বন্ধ করতে বাধ্য হয়; যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও দুঃখজনক। অনেক সদস্যকে শতভাগ শেয়ারের অর্থ বুঝিয়ে দেওয়াও সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

বাংলাদেশেও প্রায় প্রতিটি কো-অপারেটিভের মধ্যে কম-বেশি সততার অভাব, নেতৃত্বের কাড়াকাড়ি-কোন্দল-প্রতিযোগিতা, ক্ষমতার দম্ভ, স্বার্থপরতা, নানা ইজম-নেপোটিজম-মেরুকরণ, এবং সর্বোপরি অব্যবস্থাপনার কারণে অনেক কো-অপারেটিভ ব্যর্থতায় পর্যবসিত। এসবের কারণে ঋণখেলাপির পরিমাণ দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, কো-অপারেটিভের সদস্যগণ ঋণ নিয়ে বিপাকে ফেলছে সাধারণ-নিরীহ জামিনদারদের।

বছরের পর বছর ঋণের কোটি কোটি টাকা কো-অপারেটিভে ফিরে না আসার কারণে শত শত, লক্ষ লক্ষ সদস্য আর্থিকভাবে অসহনীয় ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। কো-অপারেটিভের নিয়ম অনুসারে সাধারণ জামিনদারদের অর্থ কর্তনের ফলে তাদের পথে বসতে হচ্ছে। দীর্ঘদিনের জামানত হারিয়ে জামিনদারদের হতাশাপূর্ণ জীবনধারণ করতে দেখা যাচ্ছে।

উল্লিখিত কারণে, বর্তমানে সাধারণ সদস্যরা সম্ভাব্য ঋণগ্রহীতাকে ঋণের জামিন দিতে অস্বীকৃতি জানাতে আরম্ভ করেছে, প্রয়োজনে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজেকে দুঃশ্চিন্তামুক্ত রাখার চেষ্টা করছে। এতে বিলুপ্ত হতে চলেছে সমবায়ের সেই মূলনীতি 'সকলে আমরা সবার তরে'। এতে স্তব্ধ হতে চলেছে আমাদের সমষ্টিগত শক্তি; একত্রে বেড়ে ওঠার প্রত্যাশা ও প্রত্যয়।

একটু পিছন পানে ফিরে যদি উত্তর আমেরিকার (কানাডা ও আমেরিকা) বড় বড় কো-অপারেটিভগুলোর দিকে তাকাই, তবে দেখা যাবে যে, সদস্যগণ তাদের নিজ নিজ ক্রেডিট ইউনিয়ন থেকে ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণ করে দলগতভাবে সমমনা সদস্যগণ নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। তার মধ্যে রয়েছে ডে-কেয়ার, কৃষিকাজ, দুগ্ধকামার, ইত্যাদি। পরে সমমনা মনোভাবের অভাবে সদস্যদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবহেতু মূল লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার পথ রুদ্ধ হয়। মলিন হয়ে যায় কো-অপারেটিভের আসল উদ্দেশ্য।

একাত্তরে বাংলাদেশ স্বাধীনের পর আমাদের নবগঠিত দেশে কালজয়ী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ও পৃষ্ঠপোষকতায় সমবায়ে যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে তা আরো বেগবান হয়েছে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের অধীনে। এই সরকারের প্রণোদনায় সমবায় দিবসে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতিগুলোসহ শ্রেষ্ঠ সমবায়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। দেশের সমবায়গুলোতে নারীদের সম্পৃক্ত করার অনুপ্রেরণা, সাধারণ মানুষের আর্থিক ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ, জীবনকে আরো অর্থপূর্ণ করার মানসে সমবায়ের মাধ্যমে আর্থিক জোগান, নানা উন্নয়ন প্রকল্প শুরুসহ দেশে-বিদেশে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার প্রসারে ঋণ প্রদানসহ নানবিধ দৃশ্যমান উদ্যোগ সমন্বিত জাতীয় উন্নয়নেরই পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

বর্তমানে বাংলাদেশে জাতীয় অর্থায়নে পদ্মাসেতু নির্মাণসহ বিশ্বমানের জাতীয় প্রকল্পের অবকাঠামোগুলো দৃশ্যমান হওয়ার পাশাপাশি ব্যক্তি-সচ্ছলতা বৃদ্ধিতে সমবায়ের বিকল্প নেই বললেই চলে। শক্তিশালী সমবায় অধিদপ্তরের নেতৃত্বে সমবায়ের এই উদ্যোগগুলো এগিয়ে যাচ্ছে বিশ্বমানের উন্নত দেশগুলোর কাতারে। দেশের ইতিবাচক সকল সমবায়ীর প্রত্যাশা এই 'সমবায় আন্দোলন' বদলে দিবে বাংলাদেশের বহুমুখী দারিদ্র্যের দৃশ্যপট, ঘুচবে ধনী-গরিবের ব্যবধান। সেই লক্ষ্যেই দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ।

বিশ্বের নানা দেশের সমবায়ী ঢাকা ক্রেডিটের কার্যক্রম পরিদর্শন করতে আসে প্রায় প্রতি বছর। এই সমিতি সময়ের দাবি প্রকল্পগুলো হাতে নিয়ে জনকল্যাণের বিশেষ দৃশ্যমান নজির সৃষ্টি করতে পেরেছে। বাংলাদেশ সমবায়ের ইতিহাসে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ হাসপাতাল প্রকল্প শুরু করেছে যেখানে প্রদান করা হবে বিশ্বমানের স্বাস্থ্যসেবা। স্বাস্থ্যসেবা পেতে দেশের মানুষকে যেন বিদেশে যেতে না হয়, তার ব্যবস্থা করতে এই সমিতি বদ্ধপরিকর। তিন শ শয্যার হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম বর্তমান বছরেই (২০২৩) শুরু হবে বলে জানান সমিতির কর্মকর্তাগণ।

২০১৯-২০২০ আর্থিক বছরে, বাংলাদেশের জাতীয় প্রতিবেদন অনুসারে, দেশে ১ লক্ষ ৯২ হাজার ২০টি সমবায় সমিতি রয়েছে। সমিতিগুলোর মধ্যে মোট সদস্য সংখ্যা ১ কোটি ১৫ লক্ষ ৯ হাজার ৮২৫ জন। তন্মধ্যে পুরুষ ৭৬.৮ শতাংশ এবং নারী ২৩.২। দিনদিন নারীর অংশগ্রহণ প্রতিটি ক্ষেত্রেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমবায়েও তার ব্যতিক্রম নয়। ইতিমধ্যে সমিতি ও সদস্য সংখ্য নিশ্চয়ই আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এসবই অগ্রগতিরই পূর্বলক্ষণ।

প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ও দেশের সমবায় পরিচালনার সুবিধার জন্য নতুন নতুন বিধি-আইন সংযোজন-বিয়োজন করে দেশীয় ঘরানায় কো-অপারেটিভ ব্যবস্থাপনারও কার্পণ্য নেই বর্তমান সরকারের। সমবায়কে সত্যিকারের জনকল্যাণমুখী ও গণবান্ধব করার জন্য সরকারের ও সমবায়ীর কোনো রক্ষণশীলতা না থাকার কারণে বাংলাদেশে এর সম্ভাবনার পরিসর দিন নি বেড়েই চলেছে।

সদস্যদের সততা, আন্তরিকতা, সহমর্মিতার সাথে তাদের মধ্যে সত্যিকারের কো-অপারেটিভ লিটারেসি সংযোজন করতে পারলে নিঃসন্দেহে গুণগত আর্থিক অবস্থার সাথে গুণগত জনবল গঠনে অভাবনীয় পরিবর্তন আসতে বাধ্য আমাদের প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশের সমবায় অঙ্গনে। প্রকারান্তরে, সেটাই হবে বিশ্বের কাছে অনুকরণীয়।

বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলা নিষ্পত্তি বিষয়ক কর্মশালা

২৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে সমবায় অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে 'বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলা নিষ্পত্তি বিষয়ক কর্মশালা' অনুষ্ঠিত হয়। সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. তরুণ কান্তি শিকদার কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অতিরিক্ত নিবন্ধক (অডিট ও আইন) জনাব অঞ্জন কুমার সরকারের সভাপতিত্বে কর্মশালায় অতিরিক্ত নিবন্ধক (সমিতি ব্যবস্থাপনা) জনাব আহসান কবীর অংশগ্রহণ করেন।

জনাব নাসরীন আফরোজ, নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব), এনএসডিএর মহোদয়কে সম্মাননা স্মারক প্রদান করছেন আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, নরসিংদী অধ্যক্ষ (উপ-নিবন্ধক) জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম

চট্টগ্রামে সমবায়ীদের সাথে মতবিনিময় ও সমবায় পণ্য প্রদর্শনী

বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, চট্টগ্রাম কর্তৃক 'সমবায় পণ্য প্রদর্শনী ও সমবায়ী সমাবেশ' উপলক্ষ্যে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য এম.পি প্রধান অতিথি এবং সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকার নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. তরুণ কান্তি শিকদার বিশেষ অতিথি হিসেবে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সমবায়ীদের সাথে মতবিনিময়কালে প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য বলেন যে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করছে সরকার। তিনি বলেন যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাই দেশরত্ন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে সমবায় কার্যক্রমকে বেগবান করার মাধ্যমে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছি। তিনি আন্দরকিল্লাস্থ চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক প্রাঙ্গণে বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, চট্টগ্রাম-এর উদ্যোগে চট্টগ্রাম জেলার বিশিষ্ট সমবায়ীদের সাথে মতবিনিময়কালে এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য আরও বলেন যে, বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি ছিল সাধারণ মানুষের কল্যাণের রাজনীতি। তিনি সত্যিকার অর্থে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যে সমবায়কেই একমাত্র উপায় হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন এবং অবহেলিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন এবং অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে সমবায়ে ডাক দিয়েছিলেন। আজ আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন পূরণে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছি। তিনি বলেন, সমবায় একটি সুশৃঙ্খল ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান/মাধ্যম যা দেশের বাজারভিত্তিক অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং যেখানে রয়েছে ব্যাপক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ধনী-গরীব সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ। সমবায় ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠীর উদ্যোগকে বিশ্বাস করে কিন্তু কোন প্রকার স্বেচ্ছাচারিতাকে নয়। সমবায় সমিতির সদস্যদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ ভ্রাতৃত্বভাব ও সহমর্মিতার ক্ষেত্র তৈরি করে এবং একই সঙ্গে দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা প্রতিরোধে সহায়তা করে। সামাজিক ও আর্থিক সাফল্যের সঙ্গে ব্যক্তির স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাকে দৃশ্যমান করে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ সাধনে সমবায় আন্দোলন জোরালো ভূমিকা রাখতে পারে।

বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, চট্টগ্রাম এর যুগ্ম নিবন্ধক জনাব আশীষ কুমার বড়ুয়ার সভাপতিত্বে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. তরুণ কান্তি শিকদার, চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও সাবেক মেয়র আ.জ.ম নাছির উদ্দীন, রাউজান উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এহসানুল হায়দর চৌধুর বাবুল।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, চট্টগ্রাম জেলা সমবায় অফিসার মুরাদ আহাম্মদ, আরো বক্তব্য রাখেন জেলা সমবায় কার্যালয়ের উপ-সহকারী নিবন্ধক মিন্টু বড়ুয়া, ডবলমুরিং থানা সমবায় অফিসার সুমিত দত্ত, পাঁচলাইশ

থানা সমবায় অফিসার মো. শফিউল আলম, কোতোয়ালী থানা সমবায় মো. ওসমান গনি। তাছাড়া সমবায়ীদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন মো: আবুল কাশেম, মো: সাজ্জাদ, মো: সাহাবউদ্দিন, কান্তা ইসলাম মিনু, ভদন্ত শাসন রক্ষিত ভিক্ষু, রিনা বেগম, ফাল্গুনী হিজড়া প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য কর্তৃক কদলপুর বৌদ্ধ ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি: এর সৌজন্যে হিজড়া সম্প্রদায়ের মাঝে তিনটি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।

মতবিনিময় শেষে প্রধান অতিথি চট্টগ্রাম মহানগরীর মহিলা সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শনীর স্টল সমূহ পরিদর্শন করেন। পণ্য প্রদর্শনী পরিদর্শনকালে সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সর্বাত্মক সহযোগিতার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

‘বঙ্গবন্ধু গণমুখী ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা’ প্রকল্পের উপকারভোগীর হাতে ঋণের চেক বিতরণ কার্যক্রম

যশোর জেলার মণিরামপুর উপজেলায় প্রকল্পের উপকারভোগীর হাতে ঋণের চেক তুলে দিচ্ছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি।

সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ উপজেলায় প্রকল্পের উপকারভোগীর হাতে ঋণের চেক তুলে দিচ্ছেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আলহাজ্ব এম এ মান্নান, এমপি।

জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলায় প্রকল্পের উপকারভোগীর হাতে ঋণের চেক তুলে দিচ্ছেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব আলহাজ্ব মির্জা আজম, এমপি।

রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলায় প্রকল্পের উপকারভোগীর হাতে ঋণের চেক তুলে দিচ্ছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব এইচ এন আশিকুর রহমান, এমপি।

যশোর জেলার মণিরামপুর উপজেলায় সার্বিক সমন্বয় কমিটির সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি।

কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলায় প্রকল্পের উপকারভোগীর ঋণের চেক তুলে দিচ্ছেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক ড. তরুণ কান্তি শিকদার।

SAMABAYA ● January-March 2023 ● Price Tk 25.00 ● Regd No. DA-41

বাংলাদেশের উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অগ্রযাত্রা...

Published by Department of Cooperatives, Financed by Cooperative Development Fund form Samabaya Bhaban Plot No. F-10A & F-10B,
Agargaon Civic Sector, Sher-e-Banglanagar, Dhaka-1207, Phone : 9140877 I Editor : Md. Saiful Islam